ফেলুদা সমগ্র

ব্যাঘ্র-রহস্য

সত্যজিৎ রায়

সূচিপত্র

১. বাক্স রহস্য 2
২. সিধু জ্যাঠার সঙ্গে 15
৩. দীননাথবাবুর ভাইপো 26
৪. জটায়ু হল লালমোহন গাঙ্গুলীর ছদ্মনাম 34
৫. দীননাথবাবুকে টেলিফোন 46
৬. ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের ফ্লাইট 57
৭. এখন রাত সাড়ে নটা 65
৮. দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি 73
৯. ফেরার পথে 82
১০. অমরকুমার এখন কেঁচো 91

১. বাক্স রহস্য

ক্যাপ্টেন স্কটের মেরু অভিযানের বিষয়ে একটা দারুণ লোমখাড়া-করা বই এই সবে শেষ করেছি, আর তার এত অল্প দিনের মধ্যেই যে বরফের দেশে গিয়ে পড়তে হবে সেটা ভাবতেই পারিনি। অবিশ্যি বরফের দেশ বলতে কেউ যেন আবার নর্থ পোল সাউথ পোল ভেবে না বসে। ওসব দেশে কোনও মামলার তদন্ত বা রহস্যের সমাধান করতে ফেলুদাকে কোনওদিন যেতে হবে বলে মনে হয় না। আমরা যেখানে গিয়েছিলাম সেটা আমাদেরই দেশের ভিতর; কিন্তু যে সময়টায় গিয়েছিলাম তখন সেখানে বরফ, আর সে বরফ আকাশ থেকে মিহি তুলোর মতো ভাসতে ভাসতে নীচে নেমে এসে মাটিতে পুরু হয়ে জমে, আর রোদুরে সে বরফের দিকে চাইলে চোখ ঝলসে যায়, আর সে বরফ মাটি থেকে মুঠো করে তুলে নিয়ে বল পাকিয়ে ছোঁড়া যায়।

আমাদের এই অ্যাডভেঞ্চারের শুরু হয় গত মার্চ মাসের এক বিষুদিবারের সকালে। ফেলুদার এখন গোয়েন্দা হিসাবে বেশ নাম হয়েছে, তাই ওর কাছে মক্কেলও আসে মাঝে মাঝে। তবে ভাল কেস না হলে ও নেয় না। ভাল মানে যাতে ওর আশ্চর্য বুদ্ধিটা শানিয়ে নেওয়ার সুযোগ হয় এমন কেস। এবারের কেসটা প্রথমে শুনে তেমন আহামরি কিছু মনে হয়নি। কিন্তু ফেলুদার বোধহয় একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে যার ফলে ও সেটার মধ্যে কীসের জানি গন্ধ পেয়ে নিতে রাজি হয়ে গেল। অবিশ্যি এও হতে পারে যে মক্কেল ছিলেন বেশ হামরা-চোমরা লোক, আর তাই ফেলুদা হয়তো একটা মোটা রকম দাঁও মারার সুযোগ দেখে থাকতে পারে। পরে ফেলুদাকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে ও এমন কটমট করে আমার দিকে চাইল যে আমি একেবারে বেমালুম চুপ মেরে গেলাম।

মক্কেলের নাম দীননাথ লাহিড়ী। বুধবার সন্ধ্যাবেলা ফোন করে। পরদিন সকালে সাড়ে আটটায় আসবেন বলেছিলেন, আর ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় একটা গাড়ি এসে থামার আওয়াজ পেলাম আমাদের তারা রোডের বাড়ির সামনে। গাড়ির হর্নটা অদ্ভুত ধরনের,

আর সেটা শোনামাত্র আমি দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। ফেলুদা একটা ইশারা করে আমায় থামিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, অত আদেখলামো কেন? বেলটা বাজুক।

বেল বাজার পর দরজা খুলে দিতে ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল তার গাড়িটার দিকে। এমন পোল্লায় গাড়ি আমি এক রোলস রয়েস ছাড়া আর কখনও দেখিনি। ভদ্রলোকের নিজের চেহারাটাও বেশ চোখে পড়ার মতো, যদিও সেটা তার সাইজের জন্য নয়। টকটকে ফরসা গায়ের রং, বয়স আন্দাজ পঞ্চান্নর কাছাকাছি, পরনে কোঁচানো ফিনফিনে ধুতি আর গিলে করা আদির পাঞ্জাবি, আর পায়ে সাদা শুড় তোলা নাগরা। এ ছাড়া বাঁ হাতে রয়েছে হাতির দাঁত দিয়ে বাঁধানো হাতলওয়ালা ছড়ি আর ডান হাতে রয়েছে একটা নীল চৌকো অ্যাটাচি কেস। এ রকম বাক্স আমি ঢের দেখেছি। আমাদের বাড়িতেই দুটো আছে-একটা বাবার, একটা ফেলুদার। এয়ার ইন্ডিয়া তাদের যাত্রীদের এই বাক্স বিনি। পয়সায় দেয়।

ভদ্রলোককে আমাদের ঘরের সবচেয়ে ভাল আর্ম চেয়ারটায় বসতে দিয়ে ফেলুদা তার উলটামুখে সাধারণ চেয়ারটায় বসল। ভদ্রলোক বললেন, আমিই কাল টেলিফোন করেছিলাম। আমার নাম দীননাথ লাহিড়ী।

ফেলুদা গলা খাকরিয়ে বলল, আপনি আর কিছু বলার আগে আপনাকে দুটো প্রশ্ন করতে পারি কি?

নিশ্চয়ই।

এক নম্বর–আপনার চায়ে আপত্তি আছে?

ভদ্রলোক দুহাত জোড় করে মাথা নুইয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না মিস্টার মিত্তির, অসময়ে কিছু খাওয়ার অভ্যাসটা আমার একেবারেই নেই। তবে আপনি নিজে খেতে চাইলে স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন।

ঠিক আছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন—আপনার গাড়িটা কি হিসাপানো সুইজা?

ঠিক ধরেছেন। এ জাতের গাড়ি বেশি নেই। এদেশে থার্টি ফোরে কিনেছিলেন আমার বাবা।

ফেলুদা একটু হেসে বলল, আমি অনেক ব্যাপারেই ইন্টারেস্টেড। অবিশ্যি সেটা খানিকটা আমার পেশার খাতিরেই।

আই সি। তা যাই হোক-যে জন্য আপনার কাছে আসা। আপনার কাছে ব্যাপারটা হয়তো তুচ্ছ বলে মনে হবে। আপনার রেপুটেশন আমি জানি, সুতরাং আপনাকে আমি জোর করতে পারি না, কেবলমাত্র অনুরোধ করতে পারি যে, কেসটা আপনি নিন।

ভদ্রলোকের গলার স্বর আর কথা বলার ঢঙে বনেদি ভাব থাকলেও, হামবড়া ভাব একটুও নেই। বরঞ্চ রীতিমতো ঠাণ্ডা আর ভদ্র।

আপনার কেসটা কী সেটা যদি বলেন...

মিস্টার লাহিড়ী মৃদু হেসে সামনে টেবিলের ওপর রাখা বাক্সটার দিকে দেখিয়ে বললেন, কেসও বলতে পারেন, আবার অ্যাটাচি কেসও বলতে পারেন...হেঁহেঁ। এই বাক্সটাকে নিয়েই ঘটনা।

ফেলুদা বাক্সটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, এটা বার কয়েক বিদেশে গেছে। বলে মনে হচ্ছে। ট্যাগগুলো ছোড়া হলেও, ইলাস্টিক ব্যান্ডগুলো এখনও দেখছি হাতলে লেগে রয়েছে। এক, দুই, তিন...

ভদ্রলোক বললেন, আমারটার হাতলেও ঠিক ওইরকম রয়েছে।

আপনারটার...? তার মানে এই বাক্সটা আপনার নয়?

আজ্ঞে না, মিস্টার লাহিড়ী বললেন, এটা আরেকজনের। আমারটার সঙ্গে বদল হয়ে গেছে।

আই সি...তা কীভাবে হল বদল? ট্রেনে না প্লেনে?

ট্রেনে। কালকা মেলে। দিল্লি থেকে ফিরছিলাম। একটা ফাস্ট ক্লাস কমপার্টমেন্টে চারজন যাত্রী ছিলাম! তার মধ্যে একজনের সঙ্গে বদল হয়ে গেছে!

কার সঙ্গে হয়েছে সেটা জানা নেই বোধহয়? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

অজ্ঞে না। সেটা জানা থাকলে বোধহয় আপনার কাছে আসার প্রয়োজন হত না।

বাকি তিনজনের নামও অবশ্যই জানা নেই?

একজন ছিলেন বাঙালি। নাম পাকড়াশী। দিল্লি থেকে আমারই সঙ্গে উঠলেন।

নামটা জানলেন কী করে?

অন্য আরেকটি যাত্রীর সঙ্গে তাঁর চেনা বেরিয়ে গেল। তিনি, হ্যালো মিস্টার পাকড়াশী বলে, তাঁর সঙ্গে আলাপ জুড়লেন। কথাবাতায় দুজনকেই বিজনেসম্যান বলে মনে হল। কনট্রাক্ট, টেন্ডার ইত্যাদি কথা কানে আসছিল।

যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তার নামটা জানতে পারেননি?

আজ্ঞে না। তবে তিনি অবাঙালি, যদিও বাংলা জানেন, আর মোটামুটি ভালই বলেন। কথায় বুঝলাম তিনি সিমলা থেকে আসছেন।

আর তৃতীয় ব্যক্তি? তিনি বেশির ভাগ সময় বাঙ্কের উপরেই ছিলেন, কেবল লাঞ্চ আর ডিনারের সময় নেমেছিলেন। তিনিও বাঙালি নন। দিল্লি থেকে ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পর

তিনি আমায় একটা আপেল অফার করে বলেছিলেন সেটা নিজের বাগানের আন্দাজে মনে হয় তিনিও হয়তে সিমলাতেই থাকেন, আর সেখানেই তাঁর অরচার্ড!

আপনি খেয়েছিলেন আপেলটা?

হ্যাঁ, কেন খাব না। দিব্যি সুস্বাদু আপেল।

তা হলে ট্রেনে আপনি আপনার অসময়ের নিয়মটা মানেন না বলুন! ফেলুদার ঠোঁটের কোণে মিচকি হাসি।

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে বললেন, সৰ্ব্বনাশ! আপনার দৃষ্টি এড়ানো তো ভারী কঠিন দেখছি। তবে আপনি ঠিকই বলেছেন। চলন্ত ট্রেনে সময়ের নিয়মগুলো মন সব সময় মানতে চায় না।

এক্সকিউজ মি, ফেলুদা বলল, আপনারা কে কোথায় বসে ছিলেন সেটা জানতে পারলে ভাল হত।

আমি ছিলাম একটা লোয়ার বার্থে। আমার উপরের বার্থে ছিলেন মিস্টার পাকড়াশী; উলটোদিকের আপার বার্থে ছিলেন আপেলওয়ালা, আর নীচে ছিলেন অবাঙালি বিজনেসম্যানটি।

ফেলুদা কয়েক মুহূর্ত চুপ। তারপর হাত কচলে আঙুল মটকে বলল, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড-আমি একটু চা বলছি। ইচ্ছে হলে খাবেন, না হয় না। তোপসে, তুই যা তো চট করে। আমি এক দৌড়ে ভেতরে গিয়ে শ্রীনাথকে চায়ের কথা বলে আবার বৈঠকখানায় এসে দেখি, ফেলুদা অ্যাটাচি কেসটা খুলেছে।

চাবি দেওয়া ছিল না বুঝি? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

না। আমারটাতেও ছিল না। কাজেই যে নিয়েছে সে অনায়াসে খুলে দেখতে পারে ভেতরে কী আছে। এটার মধ্যে অবিশ্যি সব মামুলি জিনিস।

সত্যিই তাই। সাবান চিরুনি কুরুশ টুথব্রাশ টুথপেস্ট, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, দুটো ভাঁজ করা খবরের কাগজ, একটা পেপার ব্যাক বই-এই সব ছাড়া বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না।

আপনার বাক্সে কোনও মূল্যবান জিনিস ছিল কি? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

দীননাথবাবু বললেন, নাথিং। এ বাক্সে যা দেখছেন, তার চেয়েও কম মূল্যবান। কেবল একটা লেখা ছিল–একটা হাতের লেখা রচনা-ভ্রমণকাহিনী-সেটা ট্রেনে পড়ব বলে সঙ্গে নিয়েছিলাম। বেশ লাগছিল পড়তে। তিব্বতের ঘটনা।

তিব্বতের ঘটনা? ফেলুদার যেন খানিকটা কৌতুহল বাড়ল।

হ্যাঁ। ১৯১৭ সালের লেখা। লেখকের নাম শম্ভুচরণ বোস। যা বুঝছি, লেখাটা আসে আমার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে। কারণ ওটা আমার জ্যাঠামশাইকে উৎসর্গ করা। আমার জ্যাঠামশাই হলেন সতীনাথ লাহিড়ী, কাঠমুণ্ডুতে থাকতেন। রাণাদের ফ্যামিলিতে প্রাইভেট টিউটরি করতেন। উনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে প্রায় অথর্ব অবস্থায় দেশে ফেরেন- পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। তার কিছুদিন পরেই মারা যান। ওর সঙ্গেই জিনিসপত্তরের মধ্যে একটা নেপালি বাক্স ছিল। আমাদের বাড়ির বক্সরুমের একটা তাকের কোনায় পড়ে থাকত। ওটার অস্তিত্বই জানতাম না। সম্প্রতি বাড়িতে আরশোলা আর ইঁদুরের উপদ্রব বড্ড বেড়েছিল বলে পেস্ট কন্ট্রোলের লোক ডাকা হয়। তাদের জন্যই বাক্সটা নামাতে হয়। আর এই বাক্সটা থেকেই লেখাটা বেরোয়।

কবে?

এই তো–আমি দিল্লি যাবার আগের দিন।

ফেলুদা অন্যমনস্ক। বিড় বিড় করে বলল, শম্ভুচরণ...শম্ভুচরণ...

যাই হাক, মিস্টার লাহিড়ী বললেন, ওই লেখার মূল্য আমার কাছে তেমন কিছু নয়। সত্যি বলতে কী, আমি বাক্সটা ফেরত পাবার ব্যাপারে কোনও আগ্রহ বোধ করছিলাম না। আর এই যে বাক্সটা দেখছেন, এটারও মালিককে পাওয়া যাবে এমন কোনও ভরসা না দেখে এটা আমার ভাইপোকে দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর কাল রাত থেকে হঠাৎ মনে হতে লাগল-এসব জিনিস দেখতে তেমন জরুরি মনে না হলেও, এর মালিকের কাছে এর কোনও কোনওটার হয়তো মূল্য থাকতেও পারে। যেমন ধরুন। এই রুমাল। এতে নকশা করে G লেখা রয়েছে। কে জানে কার সূচিকর্ম এই G? হয়তো মালিকের স্ত্রীর। হয়তো স্ত্রী আর জীবিত নেই! এই সব ভেবে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল, তাই আজ আমার ভাইপোর ঘর থেকে বাক্সটা তুলে আপনার কাছে নিয়ে এলাম। সত্যি বলতে কী, আমারটা ফেরত পাই না-পাই তাতে আমার কিছু এসে যায় না, কিন্তু এ বাক্স মালিকের কাছে পৌঁছে দিলে আমি মনে শান্তি পাব।

চা এল। ফেলুদা আজকাল চায়ের ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে হয়ে পড়েছে। এ চা আসে কার্শিয়ঙের মকাইবাড়ি টি এস্টেট থেকে। পেয়ালা সামনে এনে রাখলেই ভুর ভুর করে সুগন্ধ বেরোয়। চায়ে একটা নিঃশব্দ চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, বাক্সটা কি অনেকবার খোলার দরকার হয়েছিল ট্রেনে?

মাত্র দুবার। সকালে দিল্লিতে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই লেখাটা বার করে নিই, আর রাত্রে ঘুমোবার আগে আবার ওটা ভেতরে ঢুকিয়ে রাখি।

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরাল। দীননাথবাবু সিগারেট খান না। দুটো ধোঁয়ার রিং ছেড়ে ফেলুদা বলল, আপনি চাইছেন–এ বাক্স যার তাকে ফেরত দিয়ে আপনার বাক্সটা আপনার কাছে এনে হাজির করি।–এই তো?

হতাশ হলেন নাকি? ব্যাপারটা বড় নিরামিষ বলে মনে হচ্ছে?

ফেলুদা তার ডান হাতের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে দিয়ে বলল, না। আপনার সেন্টিমেন্ট আমি বুঝতে পেরেছি। যে ধরনের সব কেস আমার কাছে আসে সেগুলোর তুলনায় এই কেসটার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেটাও তো অস্বীকার করা যায় না।

দীননাথবাবু যেন অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। একটা লম্বা হাঁপা ছেড়ে বললেন, আপনার রাজি হওয়াটা আমার কাছে অনেকখানি।

ফেলুদা বলল, আমার যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করব। তবে বুঝতেই পারছেন, এ অবস্থায় গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়! যাই হাক, এবার আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য জেনে নিতে চাই।

বলুন!

ফেলুদা চট করে উঠে পাশেই তার শোবার ঘর থেকে তার বিখ্যাত সবুজ নোটবইটা নিয়ে এল। তারপর হাতে পেনসিল নিয়ে তার প্রশ্ন আরম্ভ করল।

কোন তারিখে রওনা হন দিল্লি থেকে?

পাঁচই মার্চ রবিবার সকাল সাড়ে ছটায় দিল্লি ছেড়েছি। কলকাতায় পৌঁছেছি পরদিন সকাল সাড়ে নটায়।

আজি হল ৯ই। অর্থাৎ গাত তরগু। আর কাল রাত্রে আপনি আমাকে টেলিফোন করেছেন।

ফেলুদা অ্যাটাচি কেসটার ভেতর থেকে একটা হলদে রঙের কোডাক ফিল্মের কৌটো বার করে তার ঢাকনার প্যাঁচটা খুলতেই তার থেকে কয়েকটা সুপুরি বেরিয়ে টেবিলের উপর পড়ল। তার একটা মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে ফেলুদা বলল, আপনার ব্যাগে এমন কিছু ছিল যা থেকে আপনার নাম-ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে?

যতদূর মনে পড়ে, কিছুই ছিল না।

হুঁ... এবার আপনার তিনজন সহযাত্রীর মোটামুটি বর্ণনা লিখে নিতে চাই। আপনি যদি একটু হেলপ করেন।

দীননাথবাবু মাথাটাকে চিতিয়ে সিলিং-এর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, পাকড়াশীর বয়স আমার চেয়ে বেশি। ষাট-পয়ষট্টি হবে। গায়ের রং মাঝারি। ব্যাকব্রাশ করা কাঁচাপাকা চুল, চোখে চশমা, কণ্ঠস্বর কর্কশ।

বেশ!

যিনি আপেল দিলেন তাঁর রং ফরসা। রোগা একহারা চেহারা, টিকোলো নাক, চোখে সোনার চশমা, দাঁড়ি গোঁফ কামানো, মাথায় টাক, কেবল ক্যানের পাশে সামান্য কাঁচা চুল। ইংরেজি উচ্চারণ প্রায় সাহেবদের মতো। সর্দি হয়েছিল! বার বার টিসুতে নাক ঝাড়ছিল।

বাবা, খাঁটি সাহেব! আর তৃতীয় ভদ্রলোক?

আদৌ মনে রাখার মতো চেহারা নয়। তবে হ্যাঁ–নিরামিষাশী। উনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভেজিটেবল থালি নিলেন ডিনার এবং লাঞ্চে।

ফেলুদা সব ব্যাপারটা খাতায় নাট করে চলেছে। শেষ হলে পর খাতা থেকে মুখ তুলে বলল, আর কিছু?

দীননাথবাবু মাথা নেড়ে বললেন, আর তো কিছু বলার মতো দেখছি না। দিনের বেলা বেশির ভাগ সময়ই আমার মন ছিল ওই লেখাটার দিকে। রাত্রে ডিনার খাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছি! ট্রেনে সচরাচর এত ভাল ঘুম হয় না। ঘুম ভেঙেছে একেবারে হাওড়ায় এসে, আর তাও মিস্টার পাকড়শী তুলে দিলেন বলে।

তার মানে আপনিই বোধহয় সব শেষে কামরা ছেড়েছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আর তার আগেই অবিশ্যি আপনার ব্যাগ অন্যের হাতে চলে গেছে।

তা তো বটেই।

ভেরি গুড। ফেলুদা খাতা বন্ধ করে পেনসিলটা শার্টের পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল, দেখি আমি কী করতে পারি।

দীননাথবাবু চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললেন, এ ব্যাপারে আপনার যা পারিশ্রমিক তা তো দেবই, তা ছাড়া আপনার কিছু ঘোরাঘুরি আছে, তদন্তের ব্যাপারে আরও এদিক ওদিক খরচ আছে, সেই বাবদ আমি কিছু ক্যাশ টাকা আপনার জন্য নিয়ে এসেছি।

ভদ্রলোক তাঁর পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা সাদা খাম বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন, আর ফেলুদাও দেখলাম বিলিতি কায়দায় ওঃ–থ্যাঙ্কস বলে সেটা দিব্যি পেনসিলের পিছনে পকেটে গুঁজে দিল।

দরজা খুলে গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে ভদ্রলোক বললেন, আমার টেলিফোন নম্বর ডিরেক্টরিতেই পাবেন। কিছু খবর পেলেই কাইন্ডলি জানাবেন, এমনকী সটান আমার বাড়িতে চলেও আসতে পারেন। সন্ধে নাগাদ এলে নিশ্চয়ই দেখা পাবেন।

হলুদ রঙের হিস্‌পানো সুইজা তার গম্ভীর শাঁখের মতো হর্ন বাজিয়ে রাস্তায় জমা হওয়া লোকদের অবাক করে দিয়ে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের দিকে চলে গেল! আমরা দুজনে বৈঠকখানায় ফিরে এলাম। যে চেয়ারে ভদ্রলোক বসেছিলেন, সেটায় বসে ফেলুদা পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে আড় ভেঙে বলল, এই ধরনের বনেদি মেজাজের লোক আজ থেকে পাঁচিশ বছর পরে আর থাকবে না।

বাক্সটা টেবিলের উপরই রাখা ছিল। ফেলুদা তার ভিতর থেকে একটা একটা করে সমস্ত জিনিস বার করে বাইরে ছড়িয়ে রাখল। অতি সাধারণ সব জিনিস। সুব মিলিয়ে পঞ্চাশ

টাকার মালা হবে কি না সন্দেহ। ফেলুদা বলল, তুই একে একে বলে যা, আমি খাতায় নোট করে নিচ্ছি। আমি একটা একটা করে জিনিস টেবিলের উপর থেকে তুলে তার নাম বলে আবার বাক্সে রেখে দিতে লাগলাম, আর ফেলুদা লিখে যেতে লাগল। সব শেষে লিস্টটা দাঁড়াল এই রকম–

১। দু ভাঁজ করা দুটো দিল্লির ইংরেজি খবরের কাগজ-একটা Sunday Statesman আর 435 Sunday Hindusthan Times.

২। একটা প্রায় অর্ধেক খরচ হওয়া বিনাকাটুথপেস্ট। টিউবের তলার খালি অংশটা পেচিয়ে উপর দিকে তুলে দেওয়া হয়েছে

৩। একটা সবুজ রঙের বিনাকী টুথব্রাশ

৪। একটা গিলেট সেফটি রেজার

৫। একটা প্যাকেটে তিনটে থিন গিলেট ব্লেঞ্ড

৬। একটা প্রায় শেষ-হয়ে-যাওয়া ওলন্ড স্পাইস শেভিং ক্রিম

৭। একটা শেভিং ব্রাশ

৮। একটা নেলক্লিপ—বেশ পুরনো

৯। একটা সেলোফেনের পাতের মধ্যে তিনটে অ্যাসপ্রোর কড়ি

১০। একটা ভাঁজ করা কলকাতা শহরের ম্যাপা-খুললে প্রায় চার ফুট বাই পাঁচ ফুট

১১। একটা কোডাক ফিল্মের কীটের মধ্যে সুপুরি

১২। একটা টেক্কা মাক দেশলাই-আনকোরা নতুন

১৩। একটা ভেনাস মাক লাল-নীল পেনসিল

১৪। একটা ভাঁজ করা রুমাল, তার এককোণে সেলাই করা নকশায় লেখা G

১৫। একটা মোরাদবাদি ছুরি বা পেন নাইফ

১৬। একটা মুখ-মোছা ছোট তোয়ালে

১৭। একটা সেফটি পিন, মর্চে ধরা

১৮। তিনটে জেম ক্লিপ, মর্চে ধরা

১৯। একটা শার্টের বোতাম

২০। একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস–এলেরি কুইনের দ্য ডোর বিটউইন

লিস্ট তৈরি হলে পর ফেলুদা উপন্যাসটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বলল, হুইলার কোম্পানির নাম রয়েছে, কিন্তু যিনি কিনেছেন তাঁর নাম নেই। পাতা ভাঁজ করে পড়ার অভ্যাস আছে ভদ্রলোকের। দুশো ছত্রিশ পাতার বই, শেষ ভাঁজের দাগ রয়েছে দুশো বারো পাতায়! আন্দাজে মনে হয়। ভদ্রলোক বইটা পড়ে শেষ করেছিলেন।

ফেলুদা বই রেখে রুমালের দিকে মন দিল।

ভদ্রলোকের নাম কিংবা পদবির প্রথম অক্ষর হল G। সম্ভবত নাম, কারণ সেটাই আরও স্বাভাবিক!

এবার ফেলুদা কলকাতার ম্যাপটা খুলে টেবিলের উপর পাতল। ম্যাপটার দিকে দেখতে দেখতে ওর দৃষ্টি হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেল। লাল পেনসিলের দাগ... হু...এক, দুই, তিন, চার.পাঁচ জায়গায়...হাঁ..চৌরঙ্গি. চৌরঙ্গি...পার্ক স্ট্রিট...হুঁ...ঠিক আছে। তোপসে একবার টেলিফোন ডিরেক্টরিটা দে তো আমায়।

ম্যাপটা আবার ভাঁজ করে বাক্সে রেখে টেলিফোন ডিরেক্টরির পাতা উলটাতে উলটাতে ফেলুদা বলল, ভাগ্য ভাল যে নামটা পাকড়াশী। তারপর পি অক্ষরে এসে একটা পাতায় একটুক্ষণ চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, সবসুদ্ধ মাত্র ষোলটা পাকড়াশীর বাড়িতে টেলিফোন- তার মধ্যে আবার দুজনে ডাক্তার। সে দুটো অবশ্যই বাদ দেওয়া যেতে পারে।

কোন?

ট্রেনে তার পরিচিত লোকটি পাকড়াশীকে মিস্টার বলে সম্বোধন করেছিল, ডক্টর নয়। ও হ্যাঁ, ঠিক ঠিক! 3 ফেলুদা টেলিফোন তুলে ডায়ালিং শুরু করে দিল। প্রতিবারই নম্বর পাবার পর ও প্রশ্ন করল, মিস্টার পাকড়াশী, কি দিল্লি থেকে ফিরেছেন? পর পর পাঁচবার উত্তর শুনে সরি বলে ফোনটা রেখে দিয়ে আবার অন্য নম্বর ডায়াল করল। ছবারের বার বোধহয় ঠিক লোককে পাওয়া গেল, কারণ কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ চলল। তারপর ধন্যবাদ বলে ফোন রেখে ফেলুদা বলল, পাওয়া গেছে। এন সি পাকড়াশী; নিজেই কথা বলল। পরশু সকালে দিল্লি থেকে ফিরেছেন কালকা মেলে! সব কিছু মিলে যাচ্ছে, তবে এর কোনও বাক্স বদল হয়নি।

তা হলে আবার বিকেলে অ্যাপিয়েন্টমেন্ট করলে কেন?

অন্য যাত্রীদের সম্পর্কে ইনফরমেশন দিতে পারে তো। লোকটার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ, যদিও ফেলুমিত্তির তাতে ঘাবড়াবার পাত্র নন। তোপসে, চ বেরিয়ে পড়ি।

সে কী, বিকেলৈ তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

তার আগে একবার সিধুজ্যাঠার কাছে যাওয়া দরকার।

২. সিধু জ্যাঠার সঙ্গে

সিধু জ্যাঠার সঙ্গে আসলে আমাদের কোনও আত্মীয়তা নেই। বাবা যখন দেশের বাড়িতে থাকতেন—আমার জন্মের আগে-তখন পাশের বাড়িতে এই সিধুজ্যাঠা থাকতেন। তাই উনি বাবার দাদা আর আমার জ্যাঠা ফেলুদা বলে, সিধুজ্যাঠার মতো এত বিষয়ে এত জ্ঞান, আর এমন আশ্চর্য স্মরণশক্তি, খুব কম লোকের থাকে।

ফেলুদা যে কেন এসেছে সিধুজ্যাঠার কাছে সেটা তার প্রশ্ন শুনে প্রথম জানতে পারলাম—

আচ্ছা, শম্ভুচরণ বোস বলে বছর ষাটেক আগের কোনও ভ্রমণ-কাহিনী লেখকের কথা আপনি জানেন? ইংরিজিতে লিখতেন। তিনি।

সিধু জ্যাঠা চোখ কপালে তুলে বললেন, বিলো কী হে ফেলু-তার লেখা তেরাইয়ের কাহিনী পড়নি?

ঠিক ঠিক, ফেলুদা বলল, এখন মনে পড়ছে। ভদ্রলোকের নামটা চেনাচেন লাগছিল। কিন্তু বইটা হাতে আসেনি কখনও।

Terrors of Terai ছিল বইয়ের নাম। ১৯১৫ সালে লন্ডনের কীগ্যান পল কোম্পানি সে বই ছেপে বার করেছিল। দুর্দান্ত শিকারি ও পর্যটক ছিলেন শম্ভুচরণ। তবে পেশা ছিল ডাক্তারি। কাঠমুণ্ডুতে প্র্যাকটিশ করত। ওখানে তখন রাজ-টাজা হয়নি। রাণারাই ছিল সর্বেসর্বা। রাণী ফ্যামিলির অনেকের কঠিন রোগ সরিয়ে দিয়েছিল শম্ভুচরণ। ওর বইয়ে এক রাণার কথা আছে। বিজয়েন্দ্র শমশের জঙ্গ বাহাদুর। শিকারের খুব শখ, অথচ ঘোর মদ্যপ। এক হাতে বন্দুক, আর এক হাতে মদের বোতল নিয়ে মাচায় বসত। অথচ জানোয়ার সামনে পড়লেই হাত স্টেডি হয়ে যেত। কিন্তু একবার হয়নি। গুলি বাঘের গায়ে লাগেনি। বাঘ লাফিয়ে পড়েছিল মাচার উপর। পাশের মাচায় ছিলেন শম্ভুচরণ। তারই

বন্দুকের অব্যর্থ গুলি শেষটায় রাণাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। অবিশ্যি রাণীও তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল একটি মহামূল্য রত্ন উপহার দিয়ে। থ্রিলিং গল্প। ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে এনে পড়ে দেখো! বাজারে চট করে পাবে না।

আচ্ছ উনি কি তিব্বতও গিয়েছিলেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

গিয়েছিল বইকী। মারা যায় টোয়েন্টিওয়ানে। আমি তখন সবে বি-এ পরীক্ষা দিয়েছি। কাগজে একটা অবিচুয়ারি বেরিয়েছিল। তাতে লিখেছিল, শম্ভুচরণ রিটায়ার করবার পর তিব্বত যায়। তবে মারা যায় কাঠমুণ্ডুতে।

হুঁ... ফেলুদা কিছুক্ষণ চুপ। তারপর কথাগুলো খুব স্পষ্ট উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে বলল, আচ্ছা! ধরুন, আজ যদি হঠাৎ জানা যায় যে, তিব্বত ভ্রমণ সম্পর্কে তার একটা অপ্রকাশিত বড় লেখা রয়েছে, ইংরিজিতে, তা হলে সেটা দামি জিনিস হবে না কি?

ওরেব্বাবা! সিধুজ্যাঠার চকচকে টাকা উত্তেজনায় নেচে উঠল। কী বলছ ফেলু–টেরাই পড়ে লন্ডন টাইমস কী উচ্ছাস করেছিল সে তো মনে আছে আমার! আর শুধু কাহিনী নয়, শম্ভুচরণের ইংরেজি ছিল যেমন স্বচ্ছ, তেমনি রংদার। একেবারে স্ফটিকের মতো। ম্যানুস্ক্রিপ্ট আছে নকি?

হয়তো আছে।

যদি তোমার হাতে আসে, আমাকে একবারটি দেখিয়ো, আর যদি অকশনে বিক্রি-টিক্রি হচ্ছে বলে খবর পাও, তা হলেও জানিয়ো। আমি হাজার পাঁচেক পর্যন্ত বিড করতে রাজি আছি।...

সিধুজ্যাঠার বাড়িতে গরম কোকো খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে ফেলুদাকে বললাম, মিস্টার লাহিড়ীর বাক্সে যে একটা এত দামি জিনিস রয়েছে সেটা তো উনি জানেনেই না। ওকে জানাবে না?

ফেলুদা বলল, অত তাড়া কীসের? আগে দেখি না কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। আর কাজের ভারটা তো আমি এমনিতেই নিয়েছি, কেবল উৎসাহটা একটু বেশি পাচ্ছি, এই যা।

নরেশচন্দ্র পাকড়াশীর বাড়িটা হল ল্যানসডাউন রোডে। দেখলেই বোঝা যায় অন্তত চল্লিশ বছরের পুরনো বাড়ি। ফেলুদা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে একটা বাড়ির কোন কোন জিনিস থেকে তার বয়সটা আন্দাজ করা যায়। যেমন, পঞ্চাশ বছর আগে একরকম জানালী ছিল যেটা চল্লিশ৷ বছর আগের বাড়িতে আর দেখা যায় না। তা ছাড়া বারান্দার রেলিং-এর প্যাটার্ন, ছাতের পাঁচিল, গেটের নকশা, গাড়িবারান্দার থাম—এই সব থেকেও বাড়ির বয়স আন্দাজ করা যায়। এ বাড়িটা নির্ঘাত উনিশশো কুড়ি থেকে ত্রিশের মধ্যে তৈরি।

ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির সামনে প্রথমেই চোখে পড়ল গেটের উপর লটকানো কাঠের ফলক, কুকুর হইতে সাবধান!” ফেলুদা বলল, কুকুরের মালিক হইতে সাবধান কথাটাও লেখা উচিত ছিল। গেট দিয়ে ঢুকে এগিয়ে গিয়ে গাড়িবারান্দার নীচে পৌঁছতেই দারোয়নের দেখা পেলাম, আর ফেলুদা তার হাতে দিয়ে দিল তার ভিজিটিং কার্ড, যাতে লেখা আছে Pradosh C. Mitter, Private investigator, মিনিট খানেকের মধ্যেই দারোয়ান ফিরে এসে হল্লাঠ, ভক্লিক আমাদের ভিতরে ডাকছেন।

মার্বেল পাথরে বাঁধানে ল্যান্ডিং পেরিয়ে প্রায় দশ ফুট উঁচু দরজার পর্দ ফাঁক করে আমরা যে ঘরটায় ঢুকলাম সেটা বৈঠকখানা। প্রকাণ্ড ঘরের তিনদিকে উঁচু উঁচু বইয়ের আলমারিতে ঠাসা বই। এ ছাড়া ফার্নিচার, কার্পেট, দেয়ালে ছবি, আর মাথার উপরে ঝাড় লণ্ঠন—এসবও আছে। কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে একটা অগোছালো অপরিষ্কার ভাব। এ বাড়িতে ঝাড়পোঁছ জিনিসটার যে বিশেষ বালাই নেই সেটা সহজেই বোঝা যায়।

মিস্টার পাকড়শীকে পেলাম বৈঠকখানার পিছন দিকের ঘরটায়। দেখে বুঝলাম এটা তাঁর আপিস—বা যাকে বলে স্টাডি। টাইপ করার শব্দ আগেই পেয়েছিলাম, ঢুকে দেখলাম ভদ্রলোক একটা সবুজ রেক্সিনে ঢাকা প্রকাণ্ড টেবিলের পিছনে একটা মান্ধাতার আমলের

প্রকাণ্ড টাইপরাইটার সামনে নিয়ে বসে আছেন। টেবিলটা রয়েছে। ঘরের ডান দিকে। বাঁ দিকে রয়েছে একটা আলাদা বসবার জায়গা। তিনটে কোঁচ, আর তার সামনে একটা নিচু গোল টেবিল। এই টেবিলের উপর আবার রয়েছে ঘুটি সাজানো একটা দাবার বোর্ড, আর তার পাশেই একটা দাবার বই। সব শেষে যেটা চোখে পড়ল সেটা হল টেবিলের পিছন দিকে কার্পেটের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শোয়া একটা জাঁদরেল কুকুর।

ভদ্রলোকের নিজের চেহারা দীননাথবাবুর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, কেবল একটা নতুন জিনিস হচ্ছে তার মুখে বাঁকানো পাইপটা।

আমরা ঘরে ঢুকতে টাইপিং বন্ধ করে ভদ্রলোক আমাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, কোনটি মিস্টার মিত্তির, আপনি না ইনি?

প্রশ্নটা হয়তো মিস্টার পাকড়াশী ঠাট্টা করেই করেছিলেন, কিন্তু ফেলুদা হাসল না। সে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, আজ্ঞে আমি। এটি আমার কাজিন।

পাকড়াশী বললেন, কী করে জানব? গানবাজনা অ্যাকটিং ছবি-আঁকা মায় গুরুগিরিতে পর্যন্ত যদি বালকদের এত ট্যালেন্ট থাকতে পারে, তা হলে গোয়েন্দাগিরিতেই বা থাকবে না কেন? যাকগে, এবারে বলুন—এই সাতে-নেই-পাঁচে-নেই মানুষটিকে এভাবে জ্বালাতে এলেন কেন।

ফেলুদা টেলিফোনে কথা বলে বলেছিল লোকটার মেজাজ রুক্ষ। আমার মনে হল, খিটখিটেমোর জন্য কম্পিটিশন থাকলে ইনি ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ন হতেন।

কে আপনাকে পাঠিয়েছে বললেন? মিস্টার পাকড়াশী প্রশ্ন করলেন।।

মিস্টার লাহিড়ীর কাছ থেকে আপনার নামটা জানি। দিল্লি থেকে আপনার সঙ্গে একই কম্পার্টমেন্টে কলকাতায় এসেছেন তিনদিন আগে।

অ। তারই বাক্স হারিয়েছে বলছে?

আরেকজনের সঙ্গে বদল হয়ে গেছে।

কেয়ারলেস ফুল। তা সেই বাক্স উদ্ধারের জন্য ডিটেকটিভ লাগাতে হল কেন? কী এমন ধনদৌলত ছিল তার মধ্যে শুনি?

বিশেষ কিছু না। একটা পুরনো ম্যানুস্ক্রিপ্ট ছিল। ভ্রমণ-কাহিনী। সেটার আর কপি নেই।

আসল কারণটা বললে পাকড়শী মশাই মোটেই ইমপ্রেসড হতেন না বলেই বাধহয় ফেলুদা লেখার কথাটা বলল!

ম্যানুস্ক্রিপ্ট? পাকড়াশীর যেন কথাটা বিশ্বাস হল না।

হ্যাঁ। শম্ভুচরণ বাসের লেখা একটা ভ্রমণকাহিনী। ট্রেনে উনি লেখাটা পড়ছিলেন। সেটা ওই বাক্সতেই ছিল।

শুধু ফুল নয়–হি সীমস টু বি এ লায়ার টু। খবরের কাগজ আর বাংলা মাসিক পত্রিকা ছাড়া আর কিসুয পড়েনি লোকটা। আমার সিট যদিও ছিল ওর ওপরের ব্যাঙ্কে, দিনের বেলাটা আমি নীচেই বসেছিলাম, ওর সিটেরই একটা পাশে। উনি কী পড়ছিলেন না-পড়ছিলেন সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট খেয়াল আছে।

ফেলুদা চুপ। ভদ্রলোক একটু দম নিয়ে বললেন, আপনি গোয়েন্দা হয়ে কী বুঝছেন জানি না; আপনার মুখে সামান্য যা শুনলাম তাতে ব্যাপারটা বেশ সাসপিশাস্ বলে মনে হচ্ছে। এনিওয়ে আপনি বুনো হাঁস ধাওয়া করতে চান করুন, কিন্তু আমার কাছ থেকে কোনও হেলপ পাবেন না। আপনাকে তো টেলিফোনেই বললুম, ওরকম এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ আমার বাড়িতে গোটা তিনেক পড়ে আছে কিন্তু এবারে সঙ্গে সে ব্যাগ ছিল না–সো আই কান্ট হেলপ ইউ।

যাত্রী চারজনের মধ্যে একজনের সঙ্গে বোধহয় আপনার চেনা বেরিয়ে গোসল–তাই না?

কে–বৃজমোহন? হ্যাঁ। তেজারতির কারবার আছে। আমার সঙ্গে এক কালে কিছু ডিলিংস হয়েছে।

তেজারাতির কারবার মানে সুদে টাকা খাটানোর ব্যবসা, সেটা ফেলুদা আমাকে পরে বলে দিয়েছিল।

ফেলুদা বলল, এই বৃজমোহনের কাছে কি ওইরকম একটা ব্যাগ থেকে থাকতে পারে?

সেটা আমি কী করে জানব, হ্যাঁ?

এর পর থেকে ভদ্রলোক ফেলুদাকে আপনি বলা বন্ধ করে তুমিতে চলে গেলেন। ফেলুদা বলল, এই ভদ্রলোকের হদিসটা দিতে পারেন?

ডিরেক্টরি দেখে নিয়ো, মিস্টার পাকড়াশী বললেন, এস এম কেন্দিয়া এন্ড কোম্পানি। এস এম হল বৃজমোহনের বাবা। ধরমতলায়–থুড়ি, লেনিন সরণিতে আপিস। তবে তুমি যে বলছি একজনের সঙ্গে আলাপ ছিল, তা নয়; আসলে তিনজনের মধ্যে দুজনকে চিনতুম আমি।

ফেলুদা যেন একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করল, অন্যজনটি কে?

দীননাথ লাহিড়ী। এককালে রেসের মাঠে দেখতুম ওকে। আলাপ হয়েছিল একবার। আগে খুব লায়েক ছিল। ইদানীং নাকি সভ্যভব্য হয়েছে। দিল্লিতে নাকি এক গুরু বাগিয়েছে। সত্যি কি মিথ্যে জানি না।

আর অন্য যে যাত্রীটি ছিলেন?

বুঝতে পারলাম ফেলুদা যতদূর পারে ইনফরমেশন সংগ্রহ করে নিচ্ছে ভদ্রলোকের কাছে। এটা কি জেরা হচ্ছে? ভদ্রলোক পাইপ কামড়ানা অবস্থাতেই তাঁর বত্রিশ পাটি দাঁত খিঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন।

আজ্ঞে না, ফেলুদা বলল, আপনি বাড়িতে বসে এক এক দাবা খেলেন, আপনার মাথা পরিষ্কার, আপনার স্মরণশক্তি ভাল–এই সব ভেবেই আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।

পাকড়াশী মশাই বোধহয় একটু নরম হলেন। গলাটা একবার খাকরে নিয়ে বললেন, চেষ্টা আমার একটা অদম্য নেশা! খেলার যে সঙ্গীটি ছিলেন তিনি গত হয়েছেন, তাই এখন একই খেলি।

রোজ?

ডেইলি। তার আরেকটা কারণ আমার ইনসমনিয়া। রাত তিনটে পর্যন্ত চলবে এই খেলা।

ঘুমের বড়ি খান না?

খাই-তবে বিশেষ কাজ দেয় না। তাতে যে শরীর কিছু খারাপ হচ্ছে তা নয়। তিনটেয় ঘুমোই, আটটায় উঠি। এ বয়সে পাঁচ ঘণ্টা ইজ এনাফ!

টাইপিংটাও কি আপনার একটা নেশা? ফেলুদা তার এক-পেশে হাসি হেসে বলল।

না। ওটা মাঝে মাঝে করি। সেক্রেটারি রেখে দেখেছি-এক ধার থেকে সব ফাঁকিবাজ। যাই হাক-আপনি অন্য যাত্রীটির কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?–শার্প চেহারা, মাথায় টাক, বাঙালি নয়, ইংরিজি উচ্চারণ ভাল, আমায় একটা আপেল অফার করেছিলেন, খাইনি। আর কিছু? আমার বয়স তিপ্পান্ন, আমার কুকুরের বয়স সাড়ে তিন। ওটা জাতে বক্সার হাউন্ড। বাইরের, লোক আমার ঘরে এসে আধঘণ্টার বেশি থাকে সেটা ও পছন্দ করে না। কাজেই–

ইন্টারেস্টিং লোক, ফেলুদা মন্তব্য করল।

আমরা ল্যানসডাউন রোডে বেরিয়ে এসে দক্ষিণে না গিয়ে উত্তর দিকে কেন চলেছি, আর পাশ দিয়ে দুটো খালি ট্যাক্সি বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ফেলুদা কেন সেগুলোকে ডাকল না, তা আমি জানি না। আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল, সেটা ফেলুদাকে না বলে পারলাম না–

আচ্ছা, দীননাথবাবু যে বলেছিলেন পাকড়াশীর বয়স ষাটের উপর, অথচ পাকড়াশী নিজে বললেন তিপ্পান্ন। আর ভদ্রলোককে দেখেও পঞ্চাশের খুব বেশি বলে মনে হয় না! এটা কীরকম হল?

ফেলুদা বলল, তাতে শুধু এইটেই প্রমাণ হয় যে, দীননাথবাবুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা খুব তীক্ষ্ণ নয়।

আরও মিনিট দুয়েক হাঁটতেই আমরা লোয়ার সারকুলার রোডে পড়লাম। ফেলুদা বা দিকে ঘুরল। আমি বললাম, সেই ডাকাতির ব্যাপারে তদন্ত করতে যাচ্ছ বুঝি? তিনদিন আগেই খবরের কাগজে বেরিয়েছে যে, লোয়ার সারকুলার রোডে হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল হাটেলের কাছেই একটা গয়নার দোকানে তিনজন মুখোশ-পরা রিভলভারধারী লোক ঢুকে বেশ কিছু দামি পাথরটাথর নিয়ে বেয়াড়াভাবে দুমদাম রিভলভার ছুঁড়তে ছুড়তে একটা কালো অ্যাম্বাসাড়ার করে পালিয়েছে। ফেলুদা খবরটা পড়ে বলেছিল, এই ধরনের একটা বেপরোয়া ক্রাইমের তদন্ত করতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেসটা ফেলুদার কাছে আসেনি। তাই আমি ভাবলাম, ও হয়তো নিজেই একটু খোঁজখবর করতে যাচ্ছে।

ফেলুদা কিন্তু আমার প্রশ্নটায় কানই দিল না। ওর ভাব দেখে মনে হল, ও ফেন ওয়াকিং এক্সারসাইজ করতে বেরিয়েছে, তাই হাঁটা ছাড়া কোনওদিকে মন নেই। কিন্তু মিনিটখানেক হাঁটার পরে ও হঠাৎ রাস্তা থেকে বাঁয়ে ঘুরে সোজা গিয়ে ঢুকল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল হাটেলের গেটের ভিতর, আর আমিও ঢুকলাম তার পেছন পেছন।

সটান রিসেপশন কাউন্টারে গিয়ে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, আপনার এখানে ৬ই মার্চ সকালে সিমলা থেকে কোনও গেস্ট এসেছিলেন কি–যার নামের প্রথম অক্ষর G?

প্রশ্নটা শুনে আমার এই প্রথম খেয়াল হল যে বৃজমোহন বা নরেশ পাকড়াশী কারুরই নামের প্রথম অক্ষর G নয়। কাজেই এখন বাকি রয়েছেন শুধু আপেলওয়ালা।

রিসেপশনের লোক খাতা দেখে বলল, দুজন সাহেবের নাম পাচ্ছি G দিয়ে–জেরাল্ড প্রাট্‌লি এবং জি আর হোমস। দুজনেই ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছিলেন।

থ্যাঙ্ক ইউ, বলে ফেলুদা বিদায় নিল।

বাইরে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নেওয়া হল। পার্ক হোটেল চলিয়ে বলে ড্রাইভারকে একটা হুকুম দিয়ে একটা চারমিনার ধরিয়ে ফেলুদা বলল, ম্যাপের উপর লাল দাগগুলো ভাল করে লক্ষ করলে –দেখতিস যে সেগুলো সব একেকটা হোটেলের জায়গায় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কলকাতায় এসে ভদ্রলোকের হাটেলে ওঠাই স্বাভাবিক। ভাল হোটেল বলতে এখন গ্র্যান্ড, হিন্দুস্থান ইনটারন্যাশনাল, পার্ক, গ্রেট ইস্টার্ন আর রিটজ কানটিনেন্টাল। দাগও ছিল ঠিক এই পাঁচ জায়গায়। আমাদের রাস্তায় প্রথম পড়ছে পার্ক হাটেল, কাজেই সেটা হবে। আমাদের গন্তব্যস্থল।

পার্ক হোটেলে ছ তারিখে নামের প্রথম অক্ষর G দিয়ে কেউ আসেনি, কিন্তু গ্র্যান্ড হাটেলে গিয়ে ভাল খবর পাওয়া গেল। একজন বাঙালি রিসেপশনিস্টের সঙ্গে দেখলাম ফেলুদার চেনাও রয়েছে। এই ভদ্রলোক-নাম দাশগুপ্ত-খাতা খুলে দেখিয়ে দিলেন যে ৬ই মার্চ সকালে পাঁচজন এ হোটেলে এসে উঠেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনই ভারতীয়, আর তিনি সিমলা থেকে এসেছিলেন, আর তাঁর নাম জি সি ধমীজা।

এখনও আছেন কি ভদ্রলোক? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

নো স্যার। গতকাল সকালে তিনি চেক-আউট করে গেছেন।

আমার মনে একটা আশার আলো জ্বলেছিল, সেটা আবার দপ করে নিভে গেল।

ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেছে। কিন্তু সে তবু প্রশ্ন করতে ছাড়ল না।

কত নম্বর ঘরে ছিলেন?

দুশো ষোলো।

সে ঘর কি এখন খালি?

অজ্ঞে হ্যাঁ। আজি সন্ধ্যায়। একজন গেস্ট আসছেন, তবে এখন খালি।

সেই ঘরের বেয়ারার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

সার্টেনলি। আমি সঙ্গে লোক দিয়ে দিচ্ছি, ও-ই আপনাকে রুম-বিয়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে।

লিফট দিয়ে দোতলায় উঠে লম্বা বারান্দা দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে গিয়ে তারপর দুশো ষোলো নম্বর ঘর। রুম-বয়ের দেখা পেয়ে তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল ফেলুদা। তারপর এদিক ওদিক দু-একবার পায়চারি করে, প্রশ্ন করল–

গতকাল সকালে যে ভদ্রলোক চলে গেছেন তাকে মনে পড়ছে?

হাঁ সাহাব।

ভাল করে মনে করে দেখ তো।–তার সঙ্গে জিনিসপত্তর কী কী ছিল।

একঠো বড় সুটকেশ থা, কালা, আউর এক ছোটা ব্যাগ।

নীল রঙের ব্যাগ কি?

হাঁ সাহাব। হাম্ যব্ ফিলাস্কমে পানি লেকর্ কামরেমে আয়া, তব্ সাহাবকে দেখা উয়ো ছোট ব্যাগ খোলকর্ সব চিজ বাহার নিকালকে বিস্তারে-পর রাখখা। মেরা মালুম হুয়া সাহাব কুছ্ ঢুঁড় রাহা।

ভেরি গুড। বাবুর সঙ্গে আপেল ছিল কি না মনে আছে?

হাঁ বাবু! তিন আপিল থা; বাহার নিকালকে পিলেটিমে রাখখা।

এর পরে বাবুর চেহারা কীরকম ছিল জিজ্ঞেস করাতে বয় যা বলল, সেরকম চেহারার লোক কলকাতায় অন্তত লাখখানেক আছে।

যাই হাক-গ্র্যান্ড হাটেলে এসে মস্ত কাজ হয়েছে। দীননাথবাবুর বাক্স যার সঙ্গে বদল হয়েছে তার নাম ঠিকানা দুটোই পাওয়া গেছে। ঠিকানাটা মিস্টার দাশগুপ্ত একটা কাগজে লিখে রেখেছিলেন। যাবার সময় সেটা ফেলুদার হাতে দিয়ে দিলেন। ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে–

G. C. Dhameeja,
'The Nook,'
Wild Flower Halt,
Simla.

৩. দীননাথবাবুর ভাইপো

দীননাথবাবুর ভাইপো

কাকা একটু বেরিয়েছেন। সাতটা নাগাত ফিরবেন।

ইনিই তা হলে দীননাথবাবুর ভাইপো

গ্র্যান্ড হোটেল থেকে বেরিয়ে নিউ এম্পায়ারের সামনের দোকান থেকে মিঠে পান। কিনে আমরা সোজা চলে এসেছি। রাডন স্ট্রিটে দীননাথবাবুর বাড়িতে। কারণটা হল আজকের ঘটনার রিপোর্ট দেওয়া। বাড়ির গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে বাঁদিকে পর পর চারটি গ্যারাজ, তার তিনটে খালি, আর একটাতে রয়েছে আরেকটা অদ্ভুত ধরনের পুরনো গাড়ি। ফেলুদা বলল ওটা নাকি ইটালিয়ান গাড়ি, নাম লাগন্ডা।

দারোয়ানের হাতে কার্ড দেবার এক মিনিটের মধ্যেই এই ইয়াং ভদ্রলোকটি বেরিয়ে এলেন। বয়স মনে হয় ত্রিশের নীচে, মাঝারি হাইট, দীননাথবাবুর মতোই ফরসা রং, উসকোথুসকো চুলের পিছন দিক বেশ লম্বা, আর কানের দুপাশে লম্বা ঝুলপি, যে রকম ঝুলপি আজকাল অনেকেই রাখছে। ভদ্রলোক একদৃষ্টি ফেলুদার দিকে চেয়ে আছেন।

ফেলুদা বলল, আমরা একটু বসতে পারি কি? একটু দরকার ছিল ওঁর সঙ্গে।

আসুন...

ভদ্রলোক আমাদের ভিতরে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। দেয়ালে আর মেঝেতে বাঘ ভালুকের ছালের ছড়াছড়ি, সামনের দরজার উপরে একটা প্রকাণ্ড বাইসনের মাথা। দীননাথবাবুর জ্যাঠামশাইও কি তা হলে শিকারি ছিলেন? হয়তো শিকারের সূত্রেই শম্ভুচরণের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব।

কাকা বিকেলে একটু বেড়াতে বেরোন! এইবার আসবেন।

ভদ্রলোকের গলার স্বর একটু বেশি রকম পাতলা! একেই কি দীননাথবাবু ধমীজার বাক্সটা দিয়েছিলেন?

আপনিই কি ফেলুমিত্তির–যিনি সোনার কেল্লার রহস্য সলভ্ করেছিলেন? ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

ফেলুদা হ্যাঁ বলে বেশ মেজাজের সঙ্গে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে একটু পিছন দিকে হেলে আরাম করে বসল। আমার কেন জানি ভদ্রলোকের মুখটা চেনা চেনা লাগছিল, যদিও কারণটা বুঝতে পারছিলাম না। শেষটায় ভাবলাম একটা চান্স নিয়ে দেখতে ক্ষতি কী? জিজ্ঞেস করলাম–

আপনি কি কোনও ফিল্মে অ্যাকটিং করেছেন?

ভদ্রলোক একটা গলা খাকরানি দিয়ে বললেন, হ্যাঁ। অশরীরী। থ্রিলার। ভিলেনের পার্ট করেছি। অবিশ্যি ছবিটা এখনও রিলিজ হয়নি।

কী নাম বলুন তো আপনার?

আসল নাম প্রবীর লাহিড়ী। ফিল্মের নাম অমরকুমার।

হ্যাঁ হ্যাঁ–অমরকুমার-মনে পড়েছে।

কোনও একটা ফিল্মের পত্রিকায় ভদ্রলোকের ছবি দেখেছি। এত পাতলা গলার স্বরে কীরকম ভিলেন হবে কে জানে!

অ্যাকটিং কি আপনার পেশা?

এবার প্রশ্নটা ফেলুদার। ভদ্রলোক চেয়ারে না বসে কেন যে দাঁড়িয়ে আছেন জানি না।

কাকার প্লাস্টিকের কারখানায় বসতে হয়। কিন্তু আমার আসল ঝোঁক অ্যাকটিং-এর দিকে।

কাকা কী বলেন?

কাকার...উৎসাহ নেই।

কেন?

কাকা ওইরকমই।

অমরকুমারের মুখ গোমড়া। বুঝলাম কাকার সঙ্গে ফিল্মের ব্যাপারে কথা কাটাকাটি হয়েছে।

একটা কথা আমার জিজ্ঞেস করার আছে। লোকটার মধ্যে একটা রাগী রাগী ভাব আছে বলেই ফেলুদা বোধহয় এত নরম করে কথা বলছে।

আমরকুমার বললেন, আপনার কথার জবাব দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কাকার কনস্ট্যান্ট খোঁচানোটা...

আপনার কাকা আপনাকে একটা এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ দিয়েছিলেন কি?

হ্যাঁ! কিন্তু সেটা দেখছি কে যেন ঝেড়ে দিয়েছে। আমাদের একটা নতুন চাকর–

ফেলুদা হেসে হাত তুলে প্রবীরবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, না, কোনও নতুন চাকরি আপনার ব্যাগ ঝেড়ে দেয়নি। ওটা রয়েছে আমার কাছে।

আপনার কাছে? প্রবীরবাবু অবাক।

হ্যাঁ। আপনার কাকাই হঠাৎ ডিসাইড করেন ওটা যার ব্যাগ তাকে ফেরত দেওয়া উচিত সে কাজের ভারটা আমাকে দিয়েছেন। এখন কথা হচ্ছে, ওর ভেতর থেকে আপনি কোনও জিনিস বার করে নিয়েছেন কি?

ন্যাচারেলি। এই তো–

প্রবীরবাবু পকেট থেকে একটা ডট পেন বার করে দেখালেন। তারপর বললেন, ব্লেড আর শেভিং ক্রিমটাও ইউজ করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে তে চান্সই হল না।

কিন্তু বুঝতেই পারছেন প্রবীরবাবু, বাক্সটা ফেরত দিতে হলে সব জিনিসপত্তর সমেত ফেরত দিতে হবে তো-একেবারে ইনট্যাক্ট!

ন্যাচারেলি!

প্রবীরবাবু ডট পেনাটা ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে সেটা পকেটে পুরে নিল। কিন্তু কাকার উপরে প্রবীরবাবুর রাগটা এখনও পড়েনি। বললেন, জিনিসটা যখন দিয়েই দিয়েছিলেন তখন সেটা নেবার সময় একবার–

প্রবীরবাবুর কথা শেষ হল না। দীননাথের গাড়ির গভীর হর্নের আওয়াজ পাওয়া মাত্র ফিল্মের ভিলেন অমরকুমার সুড়সুড়ি করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এহে–আপনারা এসে বসে আছেন?

দীননাথবাবু ঘরে ঢুকে অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে হাত দুটো নমস্কারের ভঙ্গিতে জড়ো করে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বললেন, বসুন বসুন–প্লিজ।...আপনাদের অসময়ে চা খেতে আপত্তি নেই নিশ্চয়ই। ওরে-কে আছিস–

চাকরকে চায়ের আড়ার দিয়ে ভদ্রলোক আমাদের পাশের সোফায় বসে বললেন, বলুন, কী খবর।

ফেলুদা বলল, আপনার ব্যাগ বদল হয়েছে আপেলওয়ালার সঙ্গে–নাম জি সি ধমীজা। দীননাথবাবু চোখ গোল গোল করে বললেন, আপনি এর মধ্যে এই একদিনেই নামটা বের করে ফেললেন? এ কি ম্যাজিক নাকি মশাই!

সিমলায়, ঠিকানাও জোগাড় হয়েছে। গ্র্যান্ড হোটেলে এসে ছিলেন, তিনদিন থাকার কথা ছিল, দুদিন থেকে চলে গেছেন।

চলে গেছেন?

দীননাথবাবু যেন একটু হতাশভাবেই প্রশ্নটা করলেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। হোটেল থেকে চলে গেছেন, তবে সিমলা গেছেন কি না বলতে পারি না। সেটা অবিশ্যি ওঁর সিমলার ঠিকানায় একটা টেলিগ্রাম করলেই জানতে পারবেন।

দীননাথবাবু কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে চুপ করে থেকে বললেন, আপনি এক কাজ করুন। টেলিগ্রাম অবিশ্যি আমি আজই করছি, কিন্তু ধরুন জানতে পারলাম তিনি সিমলা ফিরেছেন এবং তাঁর কাছে আমার বাক্সটা রয়েছে–তা হলেই তো আর কাজটা ফুরিয়ে যাচ্ছে না। তাঁর ব্যাগটা তো তাঁকে ফেরত দিতে হবে।

হ্যাঁ–হাঁ-তা তো বটেই। তা ছাড়া ওই ভ্রমণকাহিনীটা সম্পর্কে আমার একটা কৌতূহলও রয়েছে, কাজেই আপনার বাক্সটাও ফেরত আনতে হবে।

ভেরি গুড। আমার প্রস্তাব হচ্ছে-আমি আপনাকে সব খরচ দিচ্ছি, আপনি চট করে সিমলাটা ঘুরে আসুন। আমি বলি কী, আপনার এই ভাইটিকেও নিয়ে যান। সিমলায় এ সময় বরফ–জানেন তো? হাতের কাছে বরফ দেখেছ কখনও খোকা?

অন্য সময়ে হলে খোকা বলতে আমার রাগই হত, কিন্তু সিমলায় যাবার চান্স আছে বুঝতে পেরে ওটা আর গায়েই করলাম না। আমার বুকের ভেতর ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে গিয়েছে।

ফেলুদার পরের কথাটা শুনে কিন্তু আমার বেশ বিরক্তই লাগল। ও বলল, একটা জিনিস ভেবে দেখুন মিস্টার লাহিড়ী–আপনি কিন্তু ইচ্ছে করলে এখন যে-কোনও লোককেই সিমলা পাঠিয়ে দিতে পারেন। ওঁর বাক্সটা ফেরত দিয়ে আপনারটা নিয়ে আসা–এ ছাড়া তো কোনও কাজ নেই! কাজেই–

না না না, লাহিড়ী মশাই বেশ জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন। আপনার মতো রিলায়েবল লোক আর পাচ্ছি কোথায়? আর শুরুটা যখন আপনাকে দিয়ে হয়েছে, শেষটাও আপনিই করুন।

কেন, আপনার ভাইপো–

দীননাথবাবু মুষড়ে পড়লেন।ওর কথা আর বলবেন না। ওর দায়িত্বজ্ঞানটা বড়ই কম। কোথায় যেন এক বাংলা সিনেমায় নাম লিখিয়ে অ্যাকটিং করে এসেছে। ভাবুন তো দিকি! ওর কোনও মতিস্থির নেই। না না–ও ভাইপো-টাইপো দিয়ে হবে না। আপনিই যান। আমার চেনা ট্র্যাভেল এজেন্ট আছে–আপনাদের টিকিটপত্তর সব করে দেবে। দিল্লি পর্যন্ত প্লেন, তারপর ট্রেন। যান–গিয়ে কাজটা সেরে, দিন চারেক থেকে আরাম করে আসুন। আপনার মতা গুণী লোককে এই সুযোগটুকু দিতে পারলে আমারই আনন্দ। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যা করলেন– সত্যিই রিমার্কেবল।

চা এসে গিয়েছিল, আর তার সঙ্গে কিছু খাবার জিনিসও। ফেলুদা এক টুকরো চকোলেট কেক তুলে নিয়ে বলল, একটা জিনিস দেখার ভারী কৌতুহল হচ্ছে। যে নেপালি বাক্সটার মধ্যে লেখাটা পেয়েছিলেন, সেই বাক্সটা। হাতের কাছে আছে কি?

সে তো খুব সহজ। আমি বলে দিচ্ছি।

যে চাকর চা এনেছিল, সে-ই নেপালি বাক্সটা এনে দিল। এক হাত লম্বা, ইঞ্চি দশেক উচু প্রায়-চৌকো কাঠের বাক্সের গায়ে তামার পাত আর লাল-নীল-হলদে পাথরের কাজ করা। ডালাটা খুলতেই একটা গন্ধ পেলাম যেটা আজই আরেকবার পেয়েছি, এই কিছুক্ষণ

আগেই। নরেশ পাকড়াশীর আপিসঘরের ধুলো, পুরনা ফার্নিচার আর পুরনো পর্দার কাপড় মিলিয়ে ঠিক এই একই গন্ধ।

দীননাথবাবু বললেন, এই যে দুটো তাক দেখছেন, এর উপরটাতেই ছিল খাতাটা–একটা নেপালি কাগজের মোড়কের ভেতর।

কাক্স যে দেখছি জিনিসে ঠাসা, ফেলুদা মন্তব্য করল।

দীননাথবাবু হেসে বললেন, হ্যাঁ, একটা ছোটখাটা কিউরিও শপ বলতে পারেন। যা নোংরা, ঘেঁটে দেখার প্রবৃত্তি হয়নি আমার।

ফেলুদা উপরের তাকটা বাইরে বার করে ভিতরের জিনিসগুলো দেখছিল। পাথরের মালা, তামা ও পিতলের কাজ করা চাকতি, রোল করা তেলচিটে তাখো, কয়েকটা অচেনা ওষুধের খালি বোতল, দুটো মোমবাতি, একটা ছোট ঘণ্টা, একটা কীসের জানি হাড়, ছোট ছোট দু-তিনটে বাটি, কিছু শিকড় বাকল জাতীয় জিনিস, একটা শুকনো ফুল–সব মিলিয়ে সত্যিই একটা কিউরিওর দোকান।

ফেলুদা বলল, এ বাক্স আপনার জ্যাঠামশাইয়ের কি?

ওঁর সঙ্গেই তো এসেছিল, কাজেই...

কাঠমুণ্ডু থেকে কবে আসেন। আপনার জ্যাঠামশাই?

টোয়েন্টিথ্রিতে। সে বছরই মারা যান। আমার বয়স তখন সাত।

ভেরি ইন্টারেস্টিং বলে চায়ে চুমুক দিয়ে ফেলুদা উঠে পড়ে বলল, আপনি যখন বলছেন তখন আমরা সিমলা যাওয়াই স্থির করলাম। কাল হবে না, কারণ আমাদের দুজনেরই গরম কাপড় লক্তি থেকে আনতে হবে। পরশু কলকা মেলে বেরোনো যেতে পারে। তবে আপনি ধমীজীকে কাল টেলিগ্রাম করতে ভুলবেন না।

প্রায় সাড়ে আটটার সময় দীননাথবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে এসে বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখি জটায়ু বসে আছেন, তাঁর হাতে একটা ব্রাউন কাগজের প্যাকেট। আমাদের দেখেই একগাল হেসে বললেন, বায়স্কোপ দেখে ফিরলেন বুঝি?

৪. জটায়ু হল লালমোহন গাঙ্গুলীর ছদ্মনাম

জটায়ু হল স্বনামধন্য রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনী লেখক লালমোহন গাঙ্গুলীর ছদ্মনাম। সোনার কেল্লা অভিযানে এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এক ধরনের লোক থাকে যারা চুপচাপ বসে থাকলেও তাদের দেখে হাসি পায়। লালমোহনবাবু হলেন সেই ধরনের লোক। হাইটে ফেলুদার কাঁধের কাছে, পায়ে পাঁচ নম্বরের জুতো, শরীরটা চিমড়ে হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক ভাবে ডান হাতটা কনুইয়ের কাছে ভাঁজ করে বা হাত দিয়ে কোটের আস্তিনের ভেতর বাইসেপ টিপে দেখেন, আবার পরমুহূর্তেই পাশের ঘর থেকে আচমকা হাঁচির শব্দ শুনে আঁতকে ওঠেন।

আপনার আর শ্রীমান তপোশের জন্য আমার লেটেস্ট বইটা নিয়ে এলুম।

ভদ্রলোক প্যাকেটটা ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। সোনার কেল্লার ঘটনার পর থেকে ভদ্রলোক মাসে অন্তত তিনবার করে আমাদের বাড়িতে আসেন।

এটা কোন দেশ নিয়ে লেখা? ফেলুদা প্যাকেট খুলতে খুলতে প্রশ্ন করল।

এটা প্রায় গোটা ওয়ার্লডটা কভার করিচি। ফ্রম সুমাত্রা টু সুমেরু।

এবারে আর কোনও তথ্যের গণ্ডগোল নেই তো? ফেলুদা বইটা উলটেপালটে দেখে আমার হাতে দিয়ে দিল। এর আগে ওঁর সাহারায় শিহরণ বইতে উটের জল খাওয়া নিয়ে একটা আজগুবি কথা লিখে বসেছিলেন লালমোহনবাবু, পরে ফেলুদা সেটা শুধরে দিয়েছিল।

ভদ্রলোক বললেন, নো স্যার! আমাদের গড়পার রোদে বদন বাঁড়ুজ্যের বাড়িতে ফুল সেট এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিয়া রয়েছে। প্রত্যেকটি ফ্যাক্ট দেখে মিলিয়ে নিয়েছি।

ফেলুদার ব্রিটানিয়া না দেখে ব্রিটানিকা দেখলে আরও নিশ্চিন্ত হতাম-কথাটায় কান না দিয়ে লালমোহনবাবু বলে চললেন, একটা ক্লাইমেক্স আছে পড়ে দেখবেন–আমার হিরো প্রখর রুদ্রের সঙ্গে জলহস্তীর ফাইট।

জলহস্তী?

কীরকম থ্রিলিং ব্যাপার পড়ে দেখবেন।

কোথায় হচ্ছে ফাইটটা?

কেন, নর্থ পোলে! জলহস্তী বলচি না?

নর্থ পোলে জলহস্তী?

সে কী মশাই–ছবি দেখেননি? খ্যাংরা কাঠির মতো লম্বা লম্বা খোঁচা খোঁচা গোঁফ, দুটো করে বাইরে বেরিয়ে আসা মুলোর মতো দাঁত, থ্যাপ থ্যাপ করে বরফের ওপর দিয়ে–

সে তো সিন্ধুঘোটক। যাকে ইংরেজিতে বলে ওয়লরাস। জলহস্তী তো হিপোপটেমাস–আফ্রিকার জন্তু।

জটায়ুর জিভা লজ্জায় লাল হয়ে দু ইঞ্চি বেরিয়ে এল।

এঃ–ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা। ব্যাড মিসটেক। ঘোড়া আর হাতিতে গণ্ডগোল হয়ে গেছে। জল আর সিন্ধু তো প্রায় একই জিনিস হল কিনা! ইংরিজিটা কারেক্ট জানা ছিল, জানেন। এবার থেকে গপ্পগুলো ছাপার আগে একবার আপনাকে দেখিয়ে নেব।

আমি আসছি বলে ফেলুদা তার ঘরে চলে যাবার পর আমাকে একা পেয়ে ভদ্রলোক বললেন, তোমার দাদাকে একটু গভীর দেখছি। কোনও কেস-টেস এসেছে নাকি?

আমি বললাম, সেরকম কিছু নয়, তবে একটা ব্যাপারে আমাদের সিমলা যেতে হচ্ছে।

সিমলা? কবে?

বাধহয় পরশু।

লং টুর?

না। দিন চারেক!

ইস, ওদিকটা দেখা হয়নি, বলে ভদ্রলোক একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

ফেলুদা ফিরে এলে পর ভদ্রলোক আবার নড়েচড়ে বসলেন। আপনারা সিমলা যাচ্ছেন। শুনলাম। কোনও তদন্ত আছে নাকি?

ঠিক তদন্ত নয়। রাম-শ্যামের বাক্স অদল-বদল হয়ে গেছে। শ্যামের বাক্স রামের কাছ থেকে নিয়ে শ্যামকে ফেরত দিয়ে, শ্যামের কাছ থেকে রামের বাক্স নিয়ে রামকে ফেরত দিতে হবে।

আরেব্বাস রে–বাক্স-রহস্য?

রহস্য কি না এখনও বলতে পারি না, তবে সামান্য দু-একটা খটকার ব্যাপার–

দেখুন স্যার, জটায়ু বাধা দিয়ে বললেন, এই কমাসে আপনাকে আমি খুব থরোলি চিনেছি। আমার ধারণা, একটা কিছু ইয়ে না থাকলে আপনি কক্ষনও কেসটা নিতেন না। ঠিক করে বলুন তো ব্যাপারটা কী।

ফেলুদার কথায় বুঝলাম সে এই স্টেজে লালমোহনবাবুকে তেমন খোলাখুলি কিছু বলতে চাইছে না। বলল, কে সত্যি কথা বলছে, আর কে সত্য গোপন করছে, আর কে মিথ্যে বলছে– এগুলো পরিষ্কার না-জানা অবধি কিছু খুলে বলা সম্ভব নয়। তবে গণ্ডগোল যে একটা রয়েছে সেটা–

ব্যাস ব্যাস—এনাফ! জটায়ুর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছে। তা হলে বলুন—আপনার অনুমতি পেলেই আপনাদের সঙ্গে লটকে পড়ি।

ঠাণ্ডা সয় ধাতে? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

ঠাণ্ডা? দার্জিলিং গেছি লাস্ট ইয়ারে।

কোন মাসে?

মে।

সিমলায় এখন বরফ পড়ছে।

জটায়ু উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বলেন কী, বর–ফ? গতবার ডেজার্ট আর এবার স্নো? ফ্রম দি ফ্লাইং প্যান টু দি ফ্রিজিডেয়ার? এ তো ভাবাই যাচ্ছে না মশাই!

ফেলুদা যদিও এসব কথা বলে জটায়ুকে নিরুৎসাহ করার চেষ্টা করছিল, ভদ্রলোক সহজে দমাবার পাত্র নন। খ্যাক খ্যাক করে ভিলেনের মতো একটা হাসি হেসে বললেন, খরচের ভয় কী দেখাচ্ছেন মশাই-একুশখানা রোমাঞ্চ উপন্যাস, প্রত্যেকটা কমপক্ষে পাঁচটা করে এডিশন, তিনখানা বাড়ি হয়ে গেছে। কালকেতা শহরে আপনাদের আশীর্বাদে। এসব ব্যাপারে খরচকে কেয়ার করি না মশাই। যত দেখব, তত প্লট আসবে মাথায়, তত বইয়ের সংখ্যা বাড়বে। আর সবাই তো ফেলুমিত্তির নয় যে জলহস্তী আর সিন্ধুঘোটকের তফাত ধরবে। যা লিখব তাই গিলবে, আর যত গিলবে ততই আমার লাভ। আমার লাভের রাস্তা আটকায় এমন কার সাধ্যি আছে মশাই? অবিশ্যি আপনি যদি সোজাসুজি নিষেধ করেন, তা হলে অবিশ্যি…

ফেলুদা নিষেধ করল না। লালমোহনবাবু যাবার আগে আমরা কবে যাচ্ছি, কদিনের জন্য যাচ্ছি, কী ভাবে যাচ্ছি ইত্যাদি জেনে নিয়ে একটা খাতায় নোট করে নিয়ে বললেন, একটা গরম গেঞ্জি, দুটো পুলোভার, একটা তুলোর কোিট আর তার উপর একটা ওভার কোট চাপালে শীত মানবে না বলচেন, অ্যাঁ?

ফেলুদা বলল, তার সঙ্গে এক জোড়া দস্তানা, একটা মাঙ্কি ক্যাপ, এক জোড়া গোলোস জুতো, গরম মোজা আর ফ্রস্ট-বাইটের ওষুধ নিলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

ইস্কুলে পরীক্ষা দিতে মোটেই ভাল লাগে না, কিন্তু ফেলুদার কাছে যে পরীক্ষাটা দিতে হয় তাতে আমার কোনওই আপত্তি নেই। সত্যি বলতে কী, তার মধ্যে বেশ একটা মজা আছে, আর সেই মজার সঙ্গে মাথাটাও বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

রাত্রে খাবার পরে ফেলুদা তার খাটে উপুড় হয়ে বুকে বালিশ নিয়ে শুয়েছে, আর আমি তার পাশে বসে পরীক্ষণ দিচ্ছি। অর্থাৎ, এই নতুন কেসটার বিষয়ে ওর নানা রকম প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি!

প্রথম প্রশ্ন হল–এই বাক্স বদলের ব্যাপারে কার কার সঙ্গে আলাপ হল বল।

প্রথম দীননাথ লাহিড়ী।

বেশ। লোকটাকে কেমন মনে হয়!

ভালই তো। তবে বই-টই সম্বন্ধে বিশেষ খবর রাখে না। আর, এই যে এতগুলো টাকা খরচ করে আমাদের সিমলা পাঠাচ্ছেন, এই ব্যাপারে যেন একটু খটকা...

যে লোক দু-দুটো ওরকম ডাকসাইটে গাড়ি মেনটেন করতে পারে, তার আর যাই হাক, টাকাৰ অভাব নেই। তা ছাড়া ফেলুমিত্তিরকে এমপ্লয় করা তো একটা প্রেসটিজের ব্যাপারসেটা ভুললেও তো চলবে না।

তই যদি হয় তা হলে আর খটকার কিছু নেই। দ্বিতীয় আলাপ–নরেশচন্দ্র পাকড়াশী। তিরিক্ষি মেজাজ।

কিন্তু স্পষ্টবক্তা। সেটা একটা গুণ। সকলের থাকে না।

কিন্তু সব কথা সত্যি বলেন কি? দীননাথবাবু কি সত্যিই এককালে লায়েক ছিলেন? মানে, রেসের মাঠে-টাঠে যেতেন?

এক কালে কেন, এখনও আছেন। তবে তার মানেই যে লোকটা খারাপ, এমন কোনও কথা নেই।

তারপর অমরকুমার। মানে প্রবীর লাহিড়ী। কাকাকে পছন্দ করেন না।

স্বাভাবিক। কাকা তার অ্যাম্বিশনে বাধা দিচ্ছে, তাকে একটা বাক্স দিয়ে আবার নিয়ে নিচ্ছে, রাগ হওয়াটা স্বাভাবিক।

প্রবীরবাবুর শরীরটা বেশ মজবুত বলে মনে হল।

হ্যাঁ। হাতের কবজি চওড়া। তাই গলার আওয়াজটা আরও বেমানান লাগে।...এবার বল কালকা মেলের ফাস্ট ক্লাসের ডি কম্পার্টমেন্টের বাকি দুজন যাত্রীর কী নাম।

কেদিয়া। মাড়োয়ারি।

হ্যাঁ। সুদের ব্যবসা। সাধারণ চেহারা। নরেশ পাকড়াশীর সঙ্গে আগেই চেনা।

ভদ্রলোকের লেনিন সরণিতে সত্যিই আপিস আছে। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে দেখেছি।

অন্যজন জি সি ধমীজা। সিমলায় থাকে। আপোলের চাষ আছে।।

সেটার কোনও প্রমাণ নেই; সুতরাং বলা যেতে পারে যে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে।

কিন্তু ধমীজার সঙ্গেই যে দীননাথবাবুর বাক্সটা বদল হয়ে গেছে সেটা তো ঠিক?

বাক্সটা ফেলুদার পাশেই খাটের উপর রাখা ছিল। সেটার ঢাকনা খুলে ভিতরের জিনিসপত্তরের দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে থেকে ফেলুদা প্রায় বিড় বিড় করে বলল, হ্যাঁ...ওই একমাত্র ব্যাপার যেটা সম্বন্ধে বোধহয়...

বাক্সের ভিতরে যে ভাঁজ করা দুটো দিল্লির খবরের কাগজ ছিল, সেগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ফেলুদা ঠিক সেই ভাবেই বিড় বিড় করে বলল, এই কাগজগুলো নিয়েই, বুঝেচিস, কী রকম যেন..মনের মধ্যে একটা...

ফেলুদার বিড়াবিড়োনি থামাতে হল, কারণ টেলিফোন বেজে উঠেছে। আগে টেলিফোনটা বৈঠকখানায় থাকত। এখনও থাকে, কিন্তু ফেলুদা সুবিধের জন্য একটা এক্সটেনশন টেলিফোন নিজের খাটের পাশে বসিয়ে নিয়েছে।

হ্যালো-

কে-মিস্টার মিত্তির?

ফেলুদার হাতে টেলিফোন থাকা সত্ত্বেও, রাত্তির বলেই বোধহয় অন্য দিকের কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল।

বলুন মিস্টার লাহিড়ী-

শুনুন, মিস্টার ধমীজার কাছ থেকে একটা খবর আছে।

এর মধ্যেই টেলিগ্রামের—?

না না। টেলিগ্রাম নয়। টেলিগ্রামের উত্তর কালকের আগে আসবে না। একটা টেলিফোন পেয়েছি। এই মিনিট পাঁচেক আগে। ব্যাপারটা বলছি। ধমীজা নাকি রেলওয়ে আপিসে খোঁজ নিয়ে রিজার্ভেশন লিস্ট দেখে আমার নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করেছিল। হঠাৎ চলে যেতে হয় বলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি, কিন্তু ওঁর এক চেনা লোকের কাছে আমার বাক্সটা রেখে গেছেন। তার কাছে ধমীজার বাক্সটা নিয়ে গিয়ে ফেরত দিলেই উনি আমার বাক্সটা দিয়ে দেবেন। এই লোকটিই আমাকে ফোন করেছিল। অতএব, বুঝতেই পারছেন। ...

ম্যানুস্ক্রিপ্টটা রয়েছে কি না জিজ্ঞেস করেছেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ। সব ঠিক আছে।

বাঃ, এ তো ভাল খবর। আপনার সমস্ত ল্যাঠা চুকে গেল।

আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব অপ্রত্যাশিতভাবে। আমি মিনিট পাঁচেকে বেরিয়ে পড়ছি। আপনার বাড়ি থেকে ধমীজার বাক্সটা পিক-আপ করে নিয়ে প্রিটারিয়া স্ট্রিটে চলে যাব।

আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি মিস্টার লাহিড়ী?

বলুন।

আপনি আর কষ্ট করে আসবেন কেন? সিমলাই যখন যাচ্ছিলাম, তখন প্রিটোরিয়া স্ট্রিটেই বা যেতে অসুবিধে কী? আমি বলি কী, বাক্সটা আমিই নিয়ে আসি। ওটা আজকের রাতটা আমার কাছে থাক; আমি একবার শম্ভুচরণের লেখাটায় চোখ বুলিয়ে নিই! এটাই হবে আমার পারিশ্রমিক। কাল সকালে গিয়ে লেখা সমেত বাক্স আপনাকে ফেরত দিয়ে আসব, কেমন?

ভেরি গুড। আমার তাতে কোনওই আপত্তি নেই। ভদ্রলোকের নাম মিস্টার পুরি, ঠিকানা ফোর বাই টু প্রিটারিয়া স্ট্রিট।

ধন্যবাদ!-অলসস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল!

ফেলুদা টেলিফোন রেখে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে রইল। আমার যে কী মনের অবস্থা তা আর বলে লাভ কী? সিমলা যাওয়া ফসকে গেল, ফসকে গেল, ফসকে গেল-মাথার মধ্যে এই কথাটাই খালি বার বার ঘুরছে, আর বুকের ভিতরটা কীরকম খালি খালি লাগছে, আর বরফের দেশে যেতে যেতে যাওয়া হল না বলে মার্চ মাসের কলকাতাটা অসহ্য গরম লাগছে। কী আর করি? অন্তত এই শেষ ঘটনার সময় ফেলুদার সঙ্গে থাকা উচিত। তাই বললাম, আমি তৈরি হয়ে নিই। ফেলুদা? দু মিনিট লাগবে।

যা, চট করে যা।

জামা ছেড়ে তৈরি হয়ে মিস্টার ধমীজার ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে পৌঁছতে লাগল কুড়ি মিনিটের কিছু বেশি। প্রিটারিয়া স্ট্রিটটা লোয়ার সারকুলার রোড থেকে বেরিয়ে খানিক দূর গিয়ে রাইট অ্যাঙ্গেলে ডাইনে গিয়ে আবার রাইট অ্যাঙ্গেলে বাঁয়ে ঘুরে থিয়েটার রোডে—থুড়ি, শেক্সপিয়ার সরণিতে গিয়ে পড়েছে। এমনিতেই রাস্তাটা নির্জন, রাতও হয়েছে প্রায় সাড়ে এগারোটা, তার উপরে আজ বোধহয় অমাবস্যা-টমাবস্যা হবে। আমরা লোয়ার সাকুলার রোড দিয়ে ঢুকে রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা ট্যাক্সি চালিয়ে বুঝলাম গাড়ি থেকে বাড়ির নম্বর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। শেক্সপিয়র সরণির কাছাকাছি গিয়ে ট্যাক্সি থামিয়ে ফেলুদা পাঞ্জাবি ড্রাইভারকে বলল, নম্বরটা খুঁজে বার করতে হবে সর্দার জি-আপনি একটু দাঁড়ান, এই বাক্সটা একটা বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

সর্দারাজি বেশ অমায়িক লোক, কোনও আপত্তি করল না। আমরা রাস্তায় নেমে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। বাঁ দিকে পাঁচিলের ওপাশে বাইশতলা বিড়লা বিল্ডিং বুক

চিতিয়ে মাথা উচিয়ে আছে। ফেলুদা বলে, রাত্তির বেলা কলকাতার সবচেয়ে থমথমে জিনিস হচ্ছে এই আকাশ-ছোঁয়া আপিসের বিল্ডিংগুলো। কেবল ধড় আছে, প্রাণ নেই। দাঁড়িয়ে থাকা মৃতদেহ দেখেচিস কখনও? ওই বিল্ডিংগুলো হচ্ছে তাই।

খানিক দূর হাঁটার পর রাস্তার ডান দিকে একটা গেট পড়ল। যার গায়ে লেখা আছে চার। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখি পরের বাড়ির নম্বর পাঁচ। তা হলে দুই বাড়ির মধ্যে যে গলিটা রয়েছে তাতেই হবে চারের দুই। কী নিঝুম রাস্তা রে বাবা। টিমটিম করে দু-একটা আলো জ্বলছে, সে আলো শুধু ল্যাম্প পোস্টের তলাটুকু আলো করেছে, বাকি রাস্তা অন্ধকার থেকে গেছে। আমরা গলিটা ধরে এগোতে লাগলাম।

খানিকটা গিয়েই আরেকটা গেট চোখে পড়ল। এটা নিশ্চয়ই চারের এক। চারের দুই কি তা হলে আরও ভেতরে ওই অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে? ওদিকে তো কোনও বাড়ি আছে বলে মনে হচ্ছে না। আর থাকলেও, সে বাড়িতে যে একটাও আলো জ্বলছে না। তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গলির দুদিকে পাঁচিল; পাঁচিলের পিছনে বাড়ির বাগান থেকে গাছের ডালপালা রাস্তার উপর এসে পড়েছে। একটা ক্ষীণ গাড়ি চলাচলের শব্দ বোধহয় লোয়ার সাকুলার রোড থেকে আসছে! একটা গির্জার ঘড়ি বেজে উঠল। দূর থেকে। সেন্ট পলসের ঘড়ি। সাড়ে এগারোটা বাজল। কিন্তু এসব শব্দে প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের অস্বাভাবিক থমথমে ভাব বাড়ছে। বই কমছে না। কাছাকাছি কোথায় একটা কুকুর ডেকে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে–

ট্যাক্সি! সদারজি! সর্দারাজি!

চিৎকারটা আপনা থেকেই আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একটা লোক ডান দিকের পাঁচিল থেকে লাফিয়ে ফেলুদার উপর পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা। ফেলুদার হাতের বাক্সটা আর হাতে নেই। সে হাত খালি করে এক ঝটিকায় ঘাড় থেকে প্রথম লোকটাকে ফেলে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এটা বুঝতে পারছি একটা প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি হাতাহাতি চলেছে, কিন্তু অন্ধকারে ঠিক কী যে হচ্ছে সেটা বোঝার উপায় নেই। বাক্সটা

চোখের সামনে রাস্তায় পড়ে আছে। আমি সেটার দিকে হাত বাড়িয়েছি, আর ঠিক সেই সময় দ্বিতীয় লোকটা মুহুর্তের মধ্যে বাক্সটা ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে এক ধাক্কায় রাস্তায় ফেলে। দিয়ে উর্ধর্বশ্বাসে গলির মুখটার দিকে দৌড় দিল। এদিকে বাঁ পাশে অন্ধকারে হুটাপটি চলেছে, কিন্তু লোকটাকে ফেলুদা কেন যে ঠিক কবজ করতে পারছে না সেটা বুঝতে পারছি না।

ওঁক!

এটা আমাদের পাঞ্জাবি ড্রাইভারের পেটে-গুঁতো-খাওয়া গলার শব্দ। সে আমার চিৎকার শুনে গাড়ি ছেড়ে দৌড়ে গলির মুখটায় এসেছিল, কিন্তু ব্যাগ-চার তাকে ঘায়েল করে পালিয়েছে। দুরে আবছা ল্যাম্প পোস্টের আলোয় দেখছি সদারজি ধরাশায়ী।

ইতিমধ্যে প্রথম লোকটাও পাঁচিল টপকে উধাও। ফেলুদা পকেট থেকে রুমাল বার করে হাত মুছতে মুছতে বলল, অন্তত সের খানেক সরষের তেল মেখে এসেছিল—পাড়া সিঁদেল চোর যেরকম করে।

এই তেলের গন্ধটা অবিশ্যি লোকগুলো আসার সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিলাম, কিন্তু গন্ধের কারণটা ঠিক বুঝতে পারিনি।

ভাগ্যিস!

ফেলুদা এই কথাটা যে কেন বলল, তা বুঝতে পারলাম না। এত বড় একটা দুর্ঘটনার পরেও সে বলছে—ভাগ্যিস?

আমি বললাম, তার মানে?

ট্যাক্সির দিকে হাঁটতে হাঁটতে ফেলুদা বলল, তুই কি ভাবছিস জি সি ধমীজার বাক্স চুরি করে নিয়ে গেল ওই শয়তানগুলো?

তবে?—আমি তো অবাক!

যেটা গেল সেটা ছিল দ্য প্রপার্টি অফ প্রদোষ সি মিটার। ওর মধ্যে তিনখানা ছেঁড়া গেঞ্জি, পাঁচখানা ধুধধুড়ে রুমাল, গুচ্ছের ন্যাকড়া আর খান পাঁচেক পুরনো ছেঁড়া আনন্দবাজার। তুই যখন জামা বদলাচ্ছিলি তখন ওয়ান-নাইন-সেভানে টেলিফোন করে জেনেছি যে চারের দুই প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের কোনও টেলিফোন নেই। অবিশ্যি ওই নম্বরে যে কোনও বাড়িই নেই সেটা এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না।

আমার বুকে আবার ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে গিয়েছে।

মন বলছে, হয়তো শেষ পর্যন্ত সিমলাটা যেতেই হবে।

৫. দীননাথবাবুকে টেলিফোন

কাল রাত্রে বাড়ি ফিরেই দীননাথবাবুকে ঘটনাটা টেলিফোনে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উনি তো শুনে একেবারে থা। বললেন, এরকম একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে সেটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। এক যদি হয় যে এমনি ছ্যাঁচড়া চোর, ব্যাগটায় কিছু আছে মনে করে আপনাকে আক্রমণ করে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে।-যেমন কলকাতায় প্রায়ই ঘটে। কিন্তু তাও তো একটা ব্যাপার রয়েই যাচ্ছে-চারের দুই বলে তো কোনও বাড়িই নেই। প্রিটারিয়া স্ট্রিটে। অর্থাৎ মিস্টার পুরি ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। অর্থাৎ মিস্টার ধমীজার রেলওয়েতে খোঁজ করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ধাপ্পা। টেলিফোনটা তা হলে করল কে?

ফেলুদা বলল, সেটা জানতে পারলে তো তদন্ত ফুরিয়ে যেত মিস্টার লাহিড়ী!

কিন্তু আপনারই বা সন্দেহটা হল কী করে বলুন তো?

আসল খটকা লাগল লোকটার এত রাত্রে আপনাকে টেলিফোন করা থেকে। ধমীজা গেছেন। কালকে। তা হলে পুরি কাল কিংবা আজ দিনের বেলা ফোন করল না কেন?

হুঁ!...তা হলে তো সেই সিমলা যাবার প্ল্যানটাই রাখতে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা যে দিকে টার্ন নিচ্ছে, তাতে তো আপনাকে পাঠাতে আমার ভয়ই করছে।

ফেলুদা হেসে বলল, আপনি চিন্তা করবেন না মিস্টার লাহিড়ী। কেসটাকে এখন আর নিরামিষ বলা চলে না-বেশ পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে আমিও এখন অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করছি। নইলে আপনার টাকাগুলো নিতে রীতিমতো লজ্জা করত। যাই হাক, আপনি এখন একটা কাজ করতে পারলে ভাল হয়।

বলুন।

আপনার বাক্সে কী কী জিনিস ছিল সেটার একটা ফর্দ করে যদি আমায় পাঠিয়ে দেন তা হলে বাক্স ফেরত নেবার সময় মিলিয়ে নিতে সুবিধে হবে।

কিছুই বিশেষ ছিল না, কাজেই কাজটা খুবই সহজ। যখন আপনাদের যাবার টিকিট ইত্যাদি। পাঠাবা, তার সঙ্গেই লিস্টটাও দিয়ে দেব।

কাল চলে যাচ্ছি বলে আজ সারাটা দিন ফেলুদাকে বেশ ব্যস্ত থাকতে হল। এই একদিনেই ওর হাবভাব একেবারে বদলে গেছে। ওর মনটা যে অস্থির হয়ে আছে, সেটা ওর ঘন ঘন আঙুল মটকানো থেকেই বুঝতে পারছি। আরও বুঝতে পারছি এই যে, যে বাক্সের মধ্যে দামি কিছু নেই, তার পিছনে শয়তানের দৃষ্টি কেন যাবে-এই রহস্যের কিনারা আমারই মতো ও-ও এখনও করে উঠতে পারেনি। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টায় কাল ও আবার ব্লাক্স থেকে প্রত্যেকটা জিনিস বার করে খুঁটিয়ে দেখেছে। এমনকী টুথপেস্ট আর শেভিং ক্রিমের টিউব টিপে টিপে দেখেছে, ব্লেড়গুলো খাপ থেকে বার করে দেখেছে, খবরের কাগজের ভাঁজ খুলে দেখেছে। এত করেও সন্দেহজনক কিছুই খুঁজে পায়নি।

ফেলুদা বেরিয়ে গেল আটটার মধ্যে। কী আর করি।-কোনও রকমে কয়েক ঘণ্টা একা বাড়িতে বসে কাটানোর জন্য মনটা তৈরি করে নিলাম। বাবা ম্যাসানজোর গেছেন দিন পনেরোর জন্য। ওঁকে একটা চিঠি লিখে সিমলা যাবার কথাটা জানিয়ে দিতে হবে। ফেলুদা যাবার সময় বলে গেছে, তিন ঘণ্টার মধ্যে যদি কেউ কলিং বেল টেপে তা হলে তুই নিজে দরজা খুলবি না, শ্রীনাথকে বলবি। আমি এগারোটার মধ্যে ফিরে আসব।

বাবাকে চিঠি লিখে হাতে একটা গল্পের বই নিয়ে বৈঠকখানার সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে বাক্সের ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে সমস্ত ঘটনাগুলো ক্রমেই। আরও ধোঁয়াটে হয়ে আসতে লাগল। দীননাথবাবু, তাঁর সেই ফিল্মে অ্যাকটিং করা ভাইপো, খিটখিটে নরেশ পাকড়াশী, আপেলওয়ালা, সিমলাবাসী মিস্টার ধমীজা, সুদের কারবারি বৃজমোহন,

সবাই-যেন মনে হল মুখোশ পরা মানুষ। এমনকী, এয়ার ইন্ডিয়ার বাক্স আর তার ভিতরের প্রত্যেকটা জিনিসও যেন মুখোশ পরে বসে আছে। আর তার উপরে কাল রাত্রে প্রিটারিয়া স্ট্রিটের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা...

শেষটায় ভাবা ঘন্দ্ব করে তাক থেকে একটা পত্রিকা নিয়ে পাতা উলটাতে লাগিলাম। সিনেমা পত্রিকা-নাম তারাবাজি। এই তো সেই পত্রিকা–যাতে আমরকুমারের ছবি দেখেছিলাম। এই তো–শ্রীগুরু পিকচার্সের নির্মীয়মাণ অশরীরী ছায়াচিত্রে নবাগত অমরকুমার। মাথায় দেব আনন্দের জুয়েল থিফের ধাঁচের টুপি, গলায় মাফলার, সরু গোঁফের নীচে ঠোঁটের কোণে যাকে বলে ক্রুর হাসি। হাতে আবার একটা রিভলভার–সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ফাঁকি। নিশ্চয়ই কাঠের তৈরি।

হঠাৎ কী মনে হল, টেলিফোন ডিরেক্টরিটা খুলে একটা নাম বার করলাম। শ্রীগুরু পিকচার্স। তিপ্পান্ন নম্বর বেনটিঙ্ক স্ট্রিট টু ফোর ফাইভ ফাইভ ফোর।

নম্বর ডায়াল করলাম। ওদিকে রিং হচ্ছে। এইবার টেলিফোন তুলল।

হ্যালো–

শ্রীগুরু পিকচার্স?

আমার গলাটা মাস ছয়েক হল ভেঙে মোটার দিকে যেতে শুরু করেছে, তাই আমার বয়স যে মাত্র সাড়ে পনেরো, সেটা নিশ্চয়ই এরা বুঝতে পারবে না।

হ্যাঁ, শ্রীগুরু পিকচার্স।

আপনাদের অশরীরী ছবিতে যে নবাগত আমারকুমার কাজ করছেন, তাঁর সম্বন্ধে একটু–

আপনি মিস্টার মল্লিকের সঙ্গে কথা বলুন।

লাইনটা বোধহয় মিস্টার মল্লিককে দেওয়া হল।

www.bengaliebook.com

হ্যালো।

মিস্টার মল্লিক?

কথা বলছি।

আপনাদের একটা ছবিতে আমারকুমার বলে একজন নবাগত অ্যাকটিং করছেন কি?

তিনি তো বাদ হয়ে গেছেন–

বাদ হয়ে গেছেন?

আপনি কে কথা বলছেন?

আমি– কী নাম বলব কিছু ভেবে না পেয়ে বোকার মতো খট করে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে দিলাম। আমরকুমার, বাদ হয়ে গেছে! নিশ্চয়ই ওর গলার আওয়াজের জন্য। কাগজে ছবি-টবি বেরিয়ে যাবার পরে বাদ। অথচ ভদ্রলোক কি সে-খবরটা জানেন না? নাকি জেনেও আমাদের কাছে বেমালুম চেপে গেলেন?

বসে বসে এই সব ভাবছি। এমন সময় টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠে আমাকে বেশ খানিকটা চমকে দিল। আমি হন্তদন্ত রিসিভারটা তুলে হ্যালো বলার পর বেশ কয়েক সেকেন্ড কোনও কথা নেই। তারপর একটা খট করে শব্দ পেলাম! বুঝেছি। পাবলিক টেলিফোন থেকে কলটা আসছে। আমি আবার বললাম, হ্যালো। এবারে কথা এল–চাপা কিন্তু স্পষ্ট।

সিমলা যাওয়া হচ্ছে?

একটা অচেনা গলায় হঠাৎ কেউ এ প্রশ্ন করতে পারে এটা ভাবতেই পারিনি। তাই আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঢোক গিলে চুপ করে রইলাম।

আবার কথা এল। খসখসে গলায় রক্ত-জলি-কল্প-কথা–

গেলে বিপদ। বুঝেছ? বিপদ।

আবার খট্। এবার টেলিফোন রেখে দেওয়া হল। আর কথা শুনব না। কিন্তু যেটুকু শুনেছি তাতেই আমার হয়ে গেছে। সেই নেশাখের রাণার হাতে বাঘ-মারা বন্দুক যেভাবে কাঁপত, ঠিক সেইভাবে কাঁপা হাতে আমি টেলিফোনটা রেখে দিয়ে চেয়ারের উপর কাঠ হয়ে বসে রইলাম!

প্রায় আধা ঘণ্টা পরে চেয়ারে বসা অবস্থাতেই আবার ক্রিং শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল, কিন্তু তারপরেই বুঝলাম এটা টেলিফোন নয়, কলিং বেল। তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে দেখে নিজেই দরজা খুলতে ফেলুদা ঢুকল। তার হাতে পোল্লায় প্যাকেটটা দেখে বুঝলাম লক্তি থেকে আনা আমাদের দুজনের গরম কাপড়। ফেলুদা আমার দিকে একবার আড়াচোখে দেখে নিয়ে বলল, ঠোঁট চাটছিস কেন? কোনও গোলমেলে টেলিফোন এসেছিল নাকি?

আমি তো অবাক! কী করে বুঝলে?

রিসিভারটা যেভাবে রেখেছিস তাতেই বোঝা যাচ্ছে তা ছাড়া জটপাকানো কেস-ও রকম দু-একটা টেলিফোন না এলেই ভাবনার কারণ হত। কে করেছিল? কী বলল?

কে করেছিল জানি না; বলল, সিমলা গেলে বিপদ আছে।

ফেলুদা পাখাটা ফুল স্পিডে করে তক্তপোশের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বলল, তুই কী বললি?

কিচ্ছু না।

ইডিয়ট! তোর বলা উচিত ছিল যে আজকাল কলকাতার রাস্তাঘাটে চলতে গেলে যে বিপদ, তেমন বিপদ এক যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া আর কোথাও নেই—সিমলা তো কোন ছার!

ফেলুদা হুমকিটা এমনভাবে উড়িয়ে দিল যে আমিও আর ও বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য না করে বললাম, লন্ড্রি ছাড়া আর কোথায় গেলে?

এস এম কেদিয়ার আপিসে।

কিছু জানতে পারলে?

বৃজমোহন বাইরে মাইডিয়ার লোক! পরিষ্কার বাংলা বলে, তিন পুরুষ কলকাতায় আছে। নরেশ পাকড়াশীর সঙ্গে সত্যিই ওর লেনদেনের সম্পর্ক ছিল। মনে হল পাকড়শী এখনও কিছু টাকা ধারে। ধমীজার আপেল বৃজমোহনও খেয়েছিল। নীল এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ। ওর নেই। ট্রেনে বেশির ভাগ সময়টাই হয়। ঘুমিয়ে না হয় চোখ বুজে শুয়ে কাটিয়েছে।

আমার দিক থেকেও একটা খবর দেবার ছিল—তাই অমরকুমারের বাদ হয়ে যাওয়ার কথাটা ওকে বললাম। তাতে ফেলুদা বলল, তা হলে মনে হয় ছেলেটা হয়তো সত্যিই ভাল অভিনয় করে।

সারাদিন আমরা আমাদের গোছগাছটা সেরে ফেললাম! কাল আর সময় পাব না। কারণ ভোর সাড়ে চারটায় উঠতে হবে। মাত্র চারদিনের জন্য যাচ্ছি বলে খুব বেশি জামাকাপড় নিলাম না। সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় জটায়ু অর্থাৎ লালমোহনবাবুর কাছ থেকে একটা টেলিফোন এল। বললেন, একটা নতুন রকমের অস্ত্র নিয়েছি।-দিল্লি গিয়ে দেখাব। লালমোহনবাবুর আবার অস্ত্রশস্ত্র জমানোর শখ। রাজস্থানে একটা ভুজালি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন-যদিও সেটা কাজে লাগেনি। ভদ্রলোকের টিকিট কেনা হয়ে গেছে, বললেন, কাল সকলে সেই দমদমে দেখা হবে।

রাত আটটার কিছু পরে দীননাথবাবুর ড্রাইভার এসে আমাদের দিল্লির প্লেন ও সিমলার ট্রেনের টিকিট, আর দীননাথবাবুর কাছ থেকে একটা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিটায় লেখা আছে–

প্রিয় মিস্টার মিত্তির,
দিল্লিতে জনপথ হাটেলে একদিন ও সিমলায় ক্লার্কস হোটেলে চার দিনের রিজার্ভেশন হয়ে গেছে। আপনার কথা মতো সিমলাতে মিঃ ধমীজার নামে একটা টেলিগ্রাম করেছিলাম, এইমাত্র তার জবাব এসেছে। তিনি জানিয়েছেন আমার বাক্স তাঁর কাছে সযত্নে রাখা আছে। তিনি পরশু। বিকালে চারটার সময় আপনাকে তাঁর বাড়িতে যেতে বলেছেন। ঠিকানা আপনার কাছে আছে, তাই আর দিলাম না। আপনি আমার বাক্সের জিনিসপত্রের একটা তালিকা চেয়েছিলেন, কিন্তু এখন ভেবে দেখছি যে ওতে একটিমাত্র জিনিসই ছিল যেটা আমার কাছে কিছুটা মূল্যবান। সেটি হল বিলাতে তৈরি এক শিশি এনটারোভিয়োফর্ম ট্যাবলেট। দিশির চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী। আপনাদের যাত্রা নিরাপদ ও সফল হোক এই প্রার্থনা করি। ইতি ভবদীয়–
দীননাথ লাহিড়ী

কাল খুব ভোরে উঠতে হবে বলে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ব ভেবেছিলাম, কিন্তু পৌনে দশটায় আমাদের দরজায় কে যেন বেল টিপল। দরজা খুলে যাকে দেখলাম, তিনি যে কোনও দিন আমাদের বাড়িতে আসবেন সেটা ভাবতেই পারিনি। ফেলুদা ভিতরে ভিতরে অবাক হলেও, বাইরে একটুও সেরকম ভাব না দেখিয়ে বলল, গুড ইভনিং মিস্টার পাকড়াশী-—আসুন ভেতরে।

ভদ্রলোকের খিটখিটে ভাবটা তো আর নেই দেখছি। ঠোঁটের কোণে একটা অপ্রস্তুত হাসি, একটা কিন্তু কিন্তু ভাব, একদিনের মধ্যেই একেবারে আশ্চর্য পরিবর্তন। এত রাত্রে কী বলতে এসেছেন। উনি?

নরেশবাবু কৌচের বদলে চেয়ারটাতে বসে বললেন, অনেক রাত হয়ে গেছে—ফোন করেছিলাম বার পাঁচেক-কানেকশন হচ্ছিল না।-তাই ভাবলাম চলেই আসি। অপরাধ নেবেন–

মোটেই না। কী ব্যাপার বলুন।

একটা অনুরোধ—একটা বিশেষ রকম অনুরোধ-বলতে পারেন। একটা বেয়াড়া অনুরোধ নিয়ে এসেছি আমি।

বলুন—

দীননাথের বাক্সে যে লেখাটার কথা বলছিলেন, সেটা কি তেরাই-রচয়িতা শম্ভুচরণের কোনও রচনা?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁর তিব্বত ভ্রমণের কাহিনী।

মাই গড!

ফেলুদা চুপ। নরেশ পাকড়াশীও কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ। দেখেই বোঝা যায় তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব। তারপর মুখ খুললেন–

আপনি জানেন কি যে ভ্রমণ-কাহিনীর বই আমার সংগ্রহে যত আছে তেমন আর কলকাতায় কারুর কাছে নেই?

ফেলুদা বলল, সেটা বিশ্বাস করা কঠিন নয়। আপনার বইয়ের আলমারির দিকে যে আমার দৃষ্টি যায়নি তা নয়। সোনার জলে লেখা কতকগুলো নামও চোখে পড়েছে-স্কেন হেদিন, ইবন বাতুতা, তাভেরনিয়ে, হুকার...

আশ্চর্য দৃষ্টি তো আপনার।

ওইটেই তো ভরসা।

নরেশবাবু তাঁর বাঁকানো পাইপটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে একদৃষ্টি ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি সিমলা যাচ্ছেন তো?

এবার ফেলুদার অবাক হবার পালা। কী করে জানলেন প্রশ্নটা মুখে না বললেও তার চাহনিতে বোঝা যাচ্ছিল। নরেশবাবু একটু হেসে বললেন, দীনু লাহিড়ীর বাক্স যে ধমীজার সঙ্গে বদল হয়ে গেছে সেটা আপনার মতো তুখোড় লোকের পক্ষে বের করা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। ধমীজার নামটা তার সুটকেসে লেখা ছিল, আর এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগটা তাকে আমি নিজে ব্যবহার করতে দেখেছি! সেই বাক্স থেকে শেভিং-এর সরঞ্জাম বার করে দাড়ি কামিয়েছেন ভদ্রলোক।

কিন্তু কাল সে কথাটা বললেন না কেন?

আমি বলে দেওয়ার চেয়ে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে বার করার মধ্যে অনেক বেশি আনন্দ নয় কি? কেসটা তো আপনার। আপনি মাথা খাটবেন এবং তার জন্য আপনি পারিশ্রমিক পাবেন। গায়ে পড়ে আমি কেন হেলপ করব বলুন?

ফেলুদার ভাব দেখে বুঝলাম সে নরেশবাবুর কথাটা অস্বীকার করছে না। সে বলল, কিন্তু আপনার বেয়াড়া অনুরোধটা কী সেটা তো বললেন না।

সেটা আর কিছুই না। লাহিড়ীর বাক্স আপনি উদ্ধার করতে পারবেন নিশ্চয়ই। আর সেই সঙ্গে সেই লেখাটাও। আমার অনুরোধ আপনি ওটা ওকে ফেরত দেবেন না।

সে কী! ফেলুদা অবাক। আমিও।

তার বদলে ওটা আমাকে দিন।

আপনাকে? ফেলুদার গলার আওয়াজ তিন ধাপ চড়ে গেছে।

বললাম তো অনুরোধটা একটু বেয়াড়া। কিন্তু এ অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। ভদ্রলোক তার কনুই দুটো হাঁটুর উপর রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, তার প্রথম কারণ হচ্ছে—ওই লেখার মূল্য দীননাথ লাহিড়ীর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তার বাড়ির আলমারিতে একটাও ভাল বই দেখেছেন? দেখেননি। দ্বিতীয়ত, কাজটা আমি আপনাকে বিনা কম্পেনসেশনে করতে বলছি না। এর জন্যে আমি আপনাকে–

ভদ্রলোক কথা থামিয়ে তাঁর কোটের বুক-পকেট থেকে একটা নীল রঙের খাম টেনে বার করলেন। তারপর খামের ঢাকনা খুলে সেটা ফেলুদার দিকে এগিয়ে ধরলেন। ঢাকনা খুলতেই একটা চেনা গন্ধ আমার নাকে এসেছিল। সেটা হল করকরে নতুন নোটের গন্ধ। এখন দেখলাম খামের মধ্যে একশো টাকার নোটের তাড়া।

এতে দু হাজার আছে, নরেশবাবু বললেন, এটা আগাম! লেখাটা হাতে এলে আরও টু দেব আপনাকে।

ফেলুদা খামটা যেন দেখেও দেখল না। পকেটে হাত দিয়ে চারমিনারের প্যাকেট বার করে দিব্যি একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আমার মনে হয় দীননাথ লাহিড়ী ও-লেখার কদর করেন কি না করেন। সেটা এখানে অবান্তর। আমি যে কাজের ভারটা নিয়েছি সেটা হল। তাঁর বাক্সটা সিমলা থেকে এনে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া—সমস্ত জিনিসপত্র সমেত। ব্যাস—ফুরিয়ে গেল।

নরেশবাবু বোধহয় কথাটার কোনও জুতসই জবাব পেলেন না।

বললেন, বেশ—ওসব না হয় ছেড়েই দিলাম। আমার অনুরোধের কথাটাতেই ফিরে আসছি। লেখাটা আপনি আমায় এনে দিন। দীনু লাহিড়ীকে বলবেন সেটা মিসিং। ধমীজা বলছে

লেখাটা বাক্সে ছিল না।

ফেলুদা বলল, তাতে ধমীজার পোজিশনটা কী হচ্ছে সেটা ভেবে দেখেছেন কি? একটা সম্পূর্ণ নির্দোষ লোকের ঘাড়ে আমি এভাবে অপরাধের বোঝা চাপাতে রাজি হব—এটা আপনি কী করে ভাবলেন? মাপ করবেন মিস্টার পাকড়াশী, আপনার এ অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ ভদ্র ভাবেই বলল, গুড নাইট, মিস্টার পাকড়াশী। আশা করি আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

নরেশবাবু কয়েক মুহূর্ত থুম হয়ে বসে থেকে টাকা সমেত খামটা পকেটে পুরে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে একটা শুকনো হাসি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। তিনি রাগ করেছেন, না হতাশ হয়েছেন, না অপমানিত হয়েছেন, সেটা তাঁর মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না।

আমি মনে মনে বললাম, ফেলুদা ছাড়া অন্য কোনও গোয়েন্দা যদি অতগুলো করকরে নোটের সামনে পড়ত, তা হলে কি সে এভাবে লোভ সামলাতে পারত? বোধহয় না।

৬. ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের ফ্লাইট

ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের দুশ তেষট্টি নম্বর ফ্লাইটে আমরা তিনজনে দিল্লি চলেছি– আমি, ফেলুদা আর জটায়ু। সাড়ে সাতটার সময় প্লেন দমদম ছেড়েছে। দমদমে ওয়েটিং রুমে থাকতেই ফেলুদা বাক্স বদলের ঘটনাটা মোটামুটি লালমোহনবাবুকে বলে দিয়েছিল। শোনার সময় ভদ্রলোক বারবার উত্তেজিত হয়ে থ্রিলিং হাইলি সাসপিশাস্ ইত্যাদি বলতে লাগলেন, আর সরষের তেল গায়ে মেখে অ্যাটাক করার ব্যাপারটা একটা ছোট্ট খাতায় নোট করে নিলেন। ওয়েটিং রুমে থাকতেই ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি আগে প্লেনে চড়েছেন কি না। তাতে উনি বললেন, কল্পনার দৌড় থাকলে মানুষ কোনও কিছু না করেও সব কিছুই করে ফেলতে পারে। প্লেনে আমি চড়িনি। যদি জিজ্ঞেস করো নার্ভাস লাগছে কি না তা হলে বলব–নট এ বিট, কারণ আমি কল্পনায় শুধু প্লেনে নয়–ব্রকেটে চড়ে মুনে পর্যন্ত ঘুরে এসেছি।

এত বলার পরেও দেখলাম প্লেনটা যখন তীরবেগে রানওয়ের ওপর দিয়ে গিয়ে হঠাৎ সাই করে মাটি ছেড়ে কোনাকুনি উপর দিকে উঠল, তখন লালমোহনবাবু দুহাতে তাঁর সিটের হাতল দুটো এমন জোরসে মুঠো করে ধরলেন যে, তাঁর আঙুলের গাঁটগুলো সব ফ্যাকাসে হয়ে গেল, আর তাঁর ঠোঁটের কোণ দুটো নীচের দিকে নেমে এসে তলার দাঁতের পাটি বেরিয়ে গেল, আর মুখটা হয়ে গেল হলদে ব্লটিং পেপারের মতো।

পরে জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক বললেন, ওরকম হবেই। রকেট যখন পৃথিবী ছেড়ে শূন্যে ওঠে, তখন অ্যাস্ট্রোনটদের মুখও ওরকম বেঁকে যায়। আসলে ওপরে ওঠার সময় মানুষের সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের একটা লড়াই চলতে থাকে, আর সে লড়াইয়ের ছাপা পড়ে মানুষের মুখের ওপর। তাই মুখ বেঁকে যায়।

আমার বলার ইচ্ছে ছিল, মাধ্যাকর্ষণের জন্য মুখ বেঁকলে সকলেরই বেঁকা উচিত, শুধু লালমোহনবাবুর বেঁকবে কেন, কিন্তু ভদ্রলোক এখন সামলে নিয়ে দিব্যি ফুর্তিতে আছেন দেখে আর কিছু বললাম না।

ব্রেকফাস্টে কফি, ডিমের আমলেট, বেকন্ড বিনস, রুটি মাখন মারম্যালেন্ড, কমলালেবু আর নুন গোলমরিচের খুদে কোটার সঙ্গে ট্রেতে ছিল প্লাস্টিকের থলির ভিতর একগাদা কাঁটা-চামচ আর ছুরি। লালমোহনবাবু কফির চামচ দিয়ে অমলেট কেটে খেলেন, ছুরিটাকে চামচের মতো ব্যবহার করে শুধু শুধু মারমালেড খেলেন, আর কাঁটা দিয়ে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে গিয়ে শেষটায় না পেরে হাত দিয়ে কাজটা সারলেন। খাবার পর ফেলুদাকে বললেন, আপনাকে তখন সুপুরি খেতে দেখলুম-আর আছে নাকি? ফেলুদা তার দুটো পায়ের মাঝখানে ধমীজার বাক্সটা রেখেছিল, সেটা থেকে কোডাকের কৌটোটা বার করে লালমোহনবাবুকে দিল। বাক্সটার দিকে চোখ পড়লেই কেন জানি আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠছিল। এই বাক্সটা ফেরত দিয়ে তার বদলে ঠিক ওই রকমই একটা বাক্স আনার জন্য আমরা কলকাতা থেকে বারো শো মাইল দূরে সাত হাজার ফুট হাইটে বরফের দেশ সিমলা শহরে চলেছি!

ফেলুদা প্লেনে ওঠার পর থেকেই বিখ্যাত সবুজ খাতা (ভলুম সেভন) বার করে তার মধ্যে কী যেন ভাবছে। আমি অবিশ্যি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা ছেড়ে দিয়েছি, কারণ রহস্যটা যে ঠিক কোনখানে সেটাই এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।

দিল্লিতে নামার পর প্লেন থেকে বেরিয়ে এসে দেখি বেশ শীত। ফেলুদা বলল, তার মানে সিমলায় টাটকা স্নো-ফলা হয়েছে; উত্তর দিক থেকে সেই বরফের কনকনে হাওয়া বয়ে এসে দিল্লির শীত বাড়িয়েছে। ধমীজার ব্যাগটা ফেলুদা নিজের হাতেই রেখেছিল, আর এক মুহূর্তের জন্যও সেটাকে হাতছাড়া করেনি। লালমোহনবাবু বললেন আগ্রা হাটেলে উঠবেন।বারোটা নাগাত চানটান করে আপনাদের হাটেলে এসে মিট করব। তারপর এক সঙ্গে লাঞ্চ সেরে একটু ঘুরে বেড়ানো যাবে। ট্রেন তো সেই রাত আটটায়।

জনপথ হোটেলটা একটা পোল্লায় ব্যাপার। ছাতলা হোটেলের পাঁচতলার পাঁচশো বত্রিশ নম্বর ডাবল রুমে জিনিসপত্র যথাস্থানে রেখে ফেলুদা তার খাটে শুয়ে পড়ল! একটা প্রশ্ন আমার মাথার মধ্যে ঘুরছিল, সেটা এই সুযোগে ফেলুদাকে বলে ফেললাম–

এই বাক্স বদলের ব্যাপারে কোন জিনিসটা তোমার সবচেয়ে বেশি রহস্যজনক বলে মনে হয়?

ফেলুদা বলল, খবরের কাগজ।

একটু খুলে বলবে কি? আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মিস্টার ধমীজা দু দুটো দিল্লির কাগজ সযত্নে ভাঁজ করে তার বাক্সে পুরেছিলেন কেন– আপাতত এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে রহস্যজনক। ট্রেনে যে কাগজ কোনা হয়, শতকরা নিরানব্ববুইজন লোক সে কাগজ ট্রেনেই পড়া শেষ করে ট্রেনেই ফেলে আসে। অথচ...

এটা হল ফেলুদার কায়দা! হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবতে শুরু করবে, যেটা নিয়ে ভাবার কথা আর কারুর মাথাতেই আসবে না।

দিল্লিতে আমরা যেটুকু সময় ছিলাম তার মধ্যে লেখার মতো দুটো ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমটা তেমন কিছু নয়, দ্বিতীয়টা সাংঘাতিক।

সাড়ে বারোটার সময় লালমোহনবাবু এলে পর আমরা ঠিক করলাম লাঞ্চ সেরে যন্তর মন্তর দেখতে যাব। আড়াইশো বছর আগে রাজা মানসিংহের তৈরি এই আশ্চর্য অবজারভেটরিটা জনপথে হোটেল থেকে মাত্র দশ মিনিটের হাঁটা পথ। ফেলুদা বলল ও ঘরেই থাকবে, বাক্সটা পাহারা দেবে, আর কেসটা নিয়ে চিন্তা করবে। কাজেই আমি আর লালমোহনবাবু চলে গেলাম মানসিংহের কীর্তি দেখতে, আর সেখানেই ঘটল প্রথম ঘটনাটা।

মিনিট দশেক ঘোরাঘুরির পর লালমোহনবাবু হঠাৎ আমার কোটের আস্তিনটা ধরে বলল, একজন সাস পিশাস ক্যারেকটার বোধহয় আমাদের ফলো করছে!

উনি যাকে চোখের ইশারায় দেখালেন, তিনি একজন বুড়ো ভদ্রলোক। তার মাথায় একটা নেপালি টুপি, চোখে কালো চশমা আর কানে তুলো; সত্যিই মনে হল লোকটা সুযোগ পেলেই যেন এখান থেকে ওখান থেকে উকি মেরে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

সে কী, চেনেন মানে?।

প্লেনে আমার পাশে এসেছে। আমার সেফটি বেল্ট বাঁধতে সাহায্য করেছিল!

কোনও কথা হয়েছিল আপনার সঙ্গে?

না। আমি থ্যাঙ্কস দিলুম, উনি কিছু বললেন না। ভেরি সাসপিশাস্।

আমরা ওর বিষয় কথা বলছি সেটা বোধহয় বুড়োটা বুঝতে পেরেছিল, কারণ কিছুক্ষণ পরে তার তাকে দেখতে পেলাম না।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে প্রায় সাড়ে তিনটে হল। রিসেপশনে গিয়ে পাঁচশো বত্রিশ নম্বর ঘরের চাবি চাইতে লোকটা বলল চাবি তো নেই। আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার পরেই খেয়াল হল চাবিটা রিসেপশনে দেওয়াই হয়নি– ওটা আমার পকেটেই রয়ে গেছে। তারপর আবার খেয়াল হল, ফেলুদা যখন ঘরেই রয়েছে, তখন চাবির দরকার কী? হাটেলে থেকে তো অভ্যোস নেই, তাই মাথা গুলিয়ে গেছে।

পাঁচ তলায় লম্বা খোলা বারান্দা দিয়ে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত হেঁটে গিয়ে ডান দিকে আমাদের ঘর। দরজায় টোকা দিয়ে দেখি কোনও সাড়া নেই।

জটায়ু বললেন, তোমার দাদা বাধহয় ন্যাপ নিচ্ছেন।

আবার টোকা মারলাম, তাও কোনও জবাব নেই।

শেষটায় দরজার হাতল ঘুরিয়ে দেখি সেটা খোলা। ফেলুদা কিন্তু ভিতর থেকে ছিটিকিনি লাগিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু খোলা হলে কী হবে—দরজার পিছনে কী জানি একটা রয়েছে যার ফলে সেটা অল্প খুলে আর খুলছে না।

এবার দরজার ফাঁক দিয়ে মাথাটা খানিকটা গলাতেই একটা দৃশ্য দেখে আমার রক্ত জল হয়ে

গেল।

দরজার ঠিক পিছনটায় ফেলুদা উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে, তার ডান হাতের কনুইটা রয়েছে সামনের দিকে, আর সেটাতেই আটকাচ্ছে আমাদের দরজা।

আমার ভয়ে দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাও লালমোহনবাবুর সঙ্গে একজোটে খুব সাবধানে দরজাটাকে আরেকটু ফাঁক করে কোনওরকমে শরীরটা গলিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। ফেলুদা অজ্ঞান হয়ে ছিল; হয়তো আমাদের ঠেলা ঠেলির ফলেই এখন একটু ওপাশ এপাশ করছে, আর মুখ দিয়ে একটা গোঙানোর মতো শব্দ করছে। লালমোহনবাবু দেখলাম দরকারে বেশ কাজের মানুষ; মাথায় আর চোখে জল দিয়ে ফেলুদার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন।

ফেলুদা আরেকটা গোঙানির শব্দ করে মাথাটার উপর আলতো করে নিজের হাতটা ঠেকিয়ে মুখটা বেঁকিয়ে বলল, ওটা নেই নিশ্চয়ই।

আমি এর মধ্যে পাশের ঘরে গিয়ে দেখে এসেছি। বললাম, না ফেলুদা। বাক্স লোপাট।

ন্যাচারেলি!

ফেলুদা উঠতে যাবে, আমরা দুজনে তার দিকে হাত বাড়িয়েছি, তাতে ও বলল, ঠিক আছে, আই ক্যান ম্যানেজ। চাট শুধু ব্রহ্মতালুতে।

মিনিট দু-এক বিশ্রাম করে হাত-পা এদিক ওদিক চালিয়ে নিয়ে, টেলিফোনে চা অর্ডার দিয়ে, অবশেষে ফেলুদা আমাদের ঘটনাটা খুলে বলল।

তোরা যাবার পর আধঘণ্টা খানেক আমি খাতাটা নিয়ে বিছানায় শুয়ে কিছু কাজকর্ম করলাম। কাল রাত্রে তো ঘণ্টা দু-একের বেশি ঘুমোইনি, তাই সবে ভাবছি। একটু চোখটা বুজে জিরিয়ে নেব, এমন সময় টেলিফোনটা বাজল।

টেলিফোন?

শোন না ব্যাপারটা!–টেলিফোন ধরতে রিসেপশনের লোকটার গলা পেলাম। বলল, মিস্টার মিত্তির, একটি ভদ্রলোক নীচে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আপনাকে বিখ্যাত ডিটেকটিভ বলে চিনেছেন। তিনি আপনার একটা অটোগ্রাফ চাইছেন–আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব কি?

ফেলুদা একটু থেমে আমার দিকে ফিরে বলল, একটা জিনিস তোকে বলছি তোপসে–অটাগ্রাফ নেবার লোভের চেয়ে অটাগ্রাফ দেবার লোভটা মানুষের মধ্যে কিছু কম প্রবল নয়। অবিশ্যি ভবিষ্যতে, সাবধান হয়ে যাব, কিন্তু এই লেসনটা না পেলে হতাম কিনা সন্দেহ।

তার মানে–?

তার মানে কিছুই না। বললাম, পাঠিয়ে দাও আমার ঘরে। লোকটা এল, নক করল, দরজা খুললাম, আর খুলতেই নক পড়ল আমার মাথায়, আর তার পরেই অমাবস্যা। মুখে রুমাল বেঁধে এসেছিল, তাই চেহারাটাও...

আমার ইচ্ছে করছিল মাথার চুল ছিঁড়ি। কেন যে গেলাম মরতে যন্তর মন্তর দেখতে। লালমোহনবাবু বললেন, দিল্লিতে রয়েছি। যখন, প্রাইম মিনিস্টারকে একটা ফোন করলে হয় না?

ফেলুদা একটা শুকনো হাসি হেসে বলল, বাক্স নিয়ে সে লোকের কী লাভ হল জানি না, কিন্তু আমাদের একেবারে চরম বিপদে ফেলে দিয়ে গেল। কী বেপরোয়া শয়তান রে বাবা!

এরপর মিনিট পাঁচেক ধরে আমাদের তিনজনের নিশ্বাস ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা গোল না ঘরে। তারপর ফেলুদা বলল, রাস্তা আছে। ঠিক সিধে নয়, তবে একমাত্র রাস্তা। আর সেটা নিতেই হবে, কারণ খালি হাতে সিমলা যাওয়া চলে না।

এবার ফেলুদা টেবিলের উপর থেকে তার সবুজ নোট বুকটা নিল। তারপর ধমীজার বাক্সের জিনিসের লিস্টটা বার করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, এতে এমন জিনিস একটাও নেই যেটা দিল্লি শহরে। কিনতে যাওয়া যাবে না। এই লিস্ট দেখে মিলিয়ে মিলিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস নিতে হবে আমাদের জিনিসগুলোর অবস্থা কীরকম ছিল সেটা পরিষ্কার মনে আছে আমার। হয়তো ধমীজার চেয়ে বেশি ভাল করেই মনে আছে। কাজেই সেখানে কোনও চিন্তা নেই। এমনকী টুথপেস্ট আর শেভিং ক্রিম যতটা খরচ হয়েছিল ঠিক ততটা পর্যন্ত বার করে ফেলে দিয়ে সেই অবধি টিউবটাকে পাকিয়ে দেব। সাদা রুমাল কিনে তাতে G লেখানেও আজকের মধ্যেই সম্ভব, নকশািটা আমার মনে আছে। খবরের কাগজ দুটোর তারিখ অবিশ্যি মিলবে না, কিন্তু সেটা ধমীজা নোটিশ করবে বলে মনে হয় না। এক খরচের মধ্যে হল এক রোল কোডাক ফিল্ম–

ওই যাঃ! জটায়ু চেঁচিয়ে উঠলেন, এটা সেই যে আপনি প্লেনে আমাকে দিলেন, তারপর আর ফেরতই দেওয়া হয়নি। এই বলে তিনি পকেট থেকে সুপুরি রাখা কোডাকের কৌটোটা বার করে ফেলুদাকে দেখালেন।

ঠিক আছে। একটা ঝামেলা কমল।...কিন্তু ওটা আবার কী বেরোল আপনার পকেট থেকে?

কোডাকের কীটের সঙ্গে একটা কাগজের টুকরোও বেরিয়ে এসেছে লালমোহনবাবুর কোটের পকেট থেকে। কাগজটায় লাল পেনসিলে লেখা–

প্রাণের ভয় থাকে তো সিমলা যেয়ে না–

৭.এখন রাত সাড়ে নটা

এখন রাত সাড়ে নটা। আমরা ট্রেনে করে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কালকার দিকে ছুটে চলেছি। কালকা থেকে কাল ভোরে সিমলার ট্রেন ধরব। দিল্লি থেকে খেয়ে বেরিয়েছিলাম, তাই আর ট্রেনে ডিনার নিইনি। আমাদের কামরায় আমরা তিনজনেই রয়েছি, তাই একটা আপার বার্থ খালি। অন্য দুজনের কথা জানি না, আমার মনের মধ্যে খুশি ভয় কৌতুহল উত্তেজনা সব মিলিয়ে এমন একটা ভাব হয়েছে যে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আমার কীরকম লাগছে, তা হলে আমি বলতেই পারব না।

আমার তিনজনেই চুপচাপ যে যার নিজের ভাবনা নিয়ে বসেছিলাম, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, আচ্ছা মিস্টার মিত্তির, খুব ভাল গোয়েন্দা আর খুব ভাল ক্রিমিন্যাল– এই দুটোর মধ্যে বোধহয় খুব একটা তফাত নেই, তাই না?

ফেলুদা এত অন্যমনস্ক ছিল যে কোনও উত্তরই দিল না, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারলাম লালমোহনবাবু কেন কথাটা বললেন। ওটার সঙ্গে আজ বিকেলের একটা ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে। সেটা এখানে বলা দরকার, কারণ ফেলুদার একটা বিশেষ ক্ষমতা এতে আশ্চর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

মাত্র আধঘণ্টা। শুধু একটা ব্যাপারে এসে ঠেকে গেলাম—বাক্সের ভিতরের জিনিস জোগাড় হলেও আসল বাক্সটা নিয়েই হয়ে গেল মুশকিল।

নীল রঙের এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাগ পাওয়া যাবে কোত্থেকে? দিল্লিতে আমাদের চেনা এমন একজনও লোক নেই। যার কাছে ওরকম একটা ব্যাগের সন্ধান করা যেতে পারে! বাজারে ঠিক ওইরকমই দেখতে ব্যাগ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে এয়ার ইন্ডিয়ার লেবেল নেই, আর লেবেল না থাকলে ধমীজা নির্ঘাত আমাদের বুজরুকি ধরে ফেলবেন। শেষটায় ফেলুদা দেখি একেবারে এয়ার ইন্ডিয়ার আপিসে গিয়ে হাজির হল। ঢুকেই আমাদের দৃষ্টি

গেল কাউন্টারের সামনে চেয়ারে বসা পার্শি টুপি পরা এক ফরসা বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোকের বা দিকে তার চেয়ারের গা ঘেঁষে মাটিতে দাঁড় করানো রয়েছে একটা ঝকঝকে নতুন নীল রঙের এয়ার ইন্ডিয়ার বাক্স। ঠিক যেরকমটি দরকার সেরকম। ইতিমধ্যে অবিশ্যি আমরা একটা নীল রঙের বাজারের ব্যাগ কিনে নিয়েছিলাম।

ফেলুদা সেটা হাতে নিয়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে বুড়ো ভদ্রলোকের বাক্সের ঠিক পাশেই হাতের বাক্সটা রেখে, কাউন্টারের পিছনের লোকটাকে ওর সব চেয়ে চোস্ত ইংরিজি উচ্চারণে জিজ্ঞেস করল—আপনাদের দিল্লি থেকে কোনও ফ্লাইট ফ্রাঙ্কফুর্টে যায় কি? লোকটা অবিশ্যি তখুনি ফেলুদাকে খবরটা দিয়ে দিল, আর ফেলুদাও তক্ষুনি থ্যাঙ্ক ইউ বলে যাবার সময় এমন কায়দা করে বুড়োর ব্যাগটা তুলে নিয়ে সেই সঙ্গে পা দিয়ে আস্তে ঠেলা দিয়ে নিজের ব্যাগটা বুড়োর ব্যাগের জায়গায় রেখে দিল যে, আমার মনে হল ফেলুদার হাত সাফাইটাও তার বুদ্ধির মতোই ঝকঝকে পরিষ্কার। এটাও বলা দরকার যে বাক্স হাতে পাওয়ার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফেলুদার কারসাজির ফলে সেই বাক্স আর তার ভিতরের জিনিসপত্রের যা চেহারা হল, তা দেখে ধমীজার চাদ্দাপুরুষও সন্দেহ করবে না যে তার মধ্যে কোনও ফাঁকি আছে।

ফেলুদা এতক্ষণ খাতা খুলে বসেছিল, এবার সেটা বন্ধ করে আমাদের এই ছোট্ট কামরার ভেতরেই পায়চারি শুরু করে আপন মনেই বলে উঠল, ঠিক এই রকম একটা কম্পার্টমেন্টেই ছিলেন ওঁরা চারজন...

কখন যে কোন জিনিসটা ফেলুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সেটা বলা শক্ত। অনেক সময় কেন যে করে সেটা বলা আরও শক্ত। যেমন জলের গেলাসগুলো। কামরার দেয়ালে জানালা ও দরজার দুদিকে আংটা লাগানো আছে, আর তার মধ্যে বসানো আছে চারটে জলের গেলাস। ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে তারই একটা গেলাসের দিকে।

ট্রেনে উঠলে আপনার ঘুম হয়, না হয় না? হঠাৎ ফেলুদা প্রশ্ন করুল জটায়ুকে। জটায়ু একটা জলহস্তীর মতো বিশাল হাই তুলতে গিয়ে মাঝপথে থেমে হেসে বললেন, ঝাঁকুনিটা মন্দ লাগে না।

ফেলুদা বলল, জানি। কিন্তু সকলের পক্ষেই এই ঝাঁকুনিটা ঘুমপাড়ানির কাজ করে না। আমার এক মেসোমশাই সারারাত জেগে বসে থাকতেন। ট্রেনে। অথচ বাড়িতে খেয়েদেয়ে বালিশে মাথা দিলেই অঘোর নিদ্রা।

হঠাৎ দেখি ফেলুদা এক লাফে বাঙ্কে উঠে গেছে। উঠেই প্রথমে রিডিং লাইটটা জ্বালল। তারপর সেটার সামনে এলেরি কুইনের বইটা (যেটা দিল্লি স্টেশন থেকে ধমীজার বাক্সে রাখার জন্য কিনতে হয়েছে) খুলে ধরে কিছুক্ষণ পাতা উলটে দেখল। তারপর কিছুক্ষণ একেবারে চুপ। করে শবাসনের ভঙ্গিতে শুয়ে সিলিংয়ের আলোর দিকে চেয়ে রইল। ট্রেন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে, বাইরে মাঝে মাঝে দু-একটা বাতি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, তিনি যে অস্ত্রটার কথা বলেছিলেন সেটা কখন আমাদের দেখাবেন, এমন সময় ভদ্রলোক বললেন, একটা ভুল হয়ে গেছে। ডাইনিং কারের লোকটাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে ওদের কাছে সুপুরি আছে কি না। না থাকলে কোনও স্টেশন থেকে কিনে নিতে হবে। ধমীজার কীটোর মাল মাত্র একটিতে এসে ঠেকেছে।

লালমোহনবাবু পকেট থেকে কোডাকের কোটোটা বার করে ঢাকনা খুলে হাতের উপর কাত করলেন। কিন্তু তা থেকে সুপুরি বেরোল না।

আচ্ছা আপদ তো! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ভেতরে রয়েছে, অথচ বেরোচ্ছে না। এবার লালমোহনবাবু কৌটোটা হাতের তেলোর উপর ঝাঁকাতে শুরু করলেন, আর প্রত্যেক ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে একটা করে শালা বলতে লাগলেন। কিন্তু তাও সুপুরি বেরোল না।

দিন তো মশাই!

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা এক লাফে বাঙ্ক থেকে নেমে এক ছোবলে লালমোহনবাবুর হাত থেকে হুলদে কৌটোটা ছিনিয়ে নিলা জটায়ু এই আচমকা আক্রমণে থ।

ফেলুদা নিজে কৌটোটাকে একবার ঝাঁকিয়ে কোনও ফল হল না দেখে তার ডান হাতের কড়ে আঙুলটা কোটার ভিতরে ঢুকিয়ে চাড় দিতেই একটা খচ শব্দ করে সুপুরিটা আলগা হয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

এবার ফেলুদা কোটার মুখে নাক লাগিয়ে বলল–কীটের তলায় আঠা লাগানো ছিল। সম্ভবত অ্যারালডাইট।

বাইরে করিডরে পায়ের আওয়াজ।

তাপসে, শাট দ্য ডোর!

আমি দরজাটা এক পাশে ঠেলে বন্ধ করার সময় এক মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম আমাদের দরজার সামনে দিয়ে বাথরুমের দিকে চলে গেল। যন্তর মন্তরের সেই কালো চশমা পরা আর কানে তুলো গোঁজা বুড়ো।

স স স স...

ফেলুদার মুখ দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ বেরোল।

সে সুপুরিটা হাতের তেলোয় নিয়ে একদৃষ্টে সেটার দিকে চেয়ে আছে।

আমি এগিয়ে গেলাম ফেলুদার দিকে।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা আসলে সুপুরি নয়। একটা অন্য কিছুর গায়ে ব্রাউন রং লাগিয়ে তাকে কতকটা সুপুরির মতো দেখতে করা হয়েছে।

বাঝা উচিত ছিল রে তোপসে! ফেলুদা চাপা গলায় বলে উঠল। আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। আই হ্যাঁভ বিন এ ফুল!

এবার ফেলুদা তার হাতের কাছের জলের গেলাসটা আংটা থেকে বার করে নিয়ে তার মধ্যে সুপুরিটাকে ডুবিয়ে আঙুল দিয়ে ঘষতে লাগল। দেখতে দেখতে জলের রং খয়েরি হয়ে গেল। ধোয়া শেষ হলে পর জিনিসটাকে জল থেকে তুলে রুমাল দিয়ে মুছে ফেলুদা সেটাকে আবার হাতের উপর রাখল।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, যেটাকে সুপুরি বলে মনে হচ্ছিল সেটা আসলে একটা নিখুঁতভাবে পলকাটা ঝলমলে পাথর। চলন্ত ট্রেনের ঝাঁকুনিতে সেটা ফেলুদার ডান হাতের উপর এপাশ ওপাশ করছে, আর তার ফলে কামরার এই আধা আলোতেই তার থেকে যা ঝালকানি বেরোচ্ছে, তাতে মনে হয় বুঝি হিরে।

আর সত্যিই যদি তাই হয়, তা হলে বলব এত বড় হিরে আমি জীবনে কখনও দেখিনি, আর লালমোহনবাবুও দেখেননি, আর ফেলুদাও দেখেছে কি না সন্দেহ।

এ-এটা কি ডা-ডাই-ডাই...

লালমোহনবাবুর মাথাটা যে গণ্ডগোল হয়ে গেছে সেটা তাঁর কথা বলার ঢং থেকেই বুঝতে পারলাম। ফেলুদা পাথরটা হাতের মুঠোয় নিয়ে এক লাফে উঠে গিয়ে দরজাটা লক করে দিয়ে আবার জায়গায় ফিরে এসে চাপা গলায় বলল, এমনিতেই তো মৃত্যুভয় দেখাচ্ছে আপনি আবার তার মধ্যে ডাই ডাই করছেন?

না—মানে-

যে রেটে এই বাক্সের পিছনে লোক লেগেছে, তাতে হিরে হওয়া কিছুই আশ্চর্য না। তবে আমি তো আর জহুরি নই।

তা হলে এর ভ্যা-ভ্যা—

হিরের ভ্যালু সম্বন্ধে আমার খুব পরিষ্কার জ্ঞান নেই। ক্যারেটের একটা আন্দাজ আছে–কোহিনুরের ছবি অ্যাকচুয়েল সাইজে দেখেছি। আন্দাজে মনে হয় এটা পঞ্চাশ ক্যারেটের কাছাকাছি হবে। দাম লাখ-টাখ ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে যাবার কথা।

ফেলুদা এখনও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাথরটাকে দেখছে। আমি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ধমীজার কাছে এ জিনিস গেল কী করে?

ফেলুদা বলল, লোকটা আপেলের চাষ করে, আর ট্রেনে ডিটেকটিভ বই পড়ে-এ ছাড়া যখন আর বিশেষ কিছুই জানা যায়নি, তখন প্রশ্নটার জবাব আর কী করে দিই বল।

এতক্ষণে লালমোহনবাবু মোটামুটি গুছিয়ে কথা বলতে পারলেন–তা হলে এই পাথর কি সেই ধমীজার কাছেই ফেরত চলে যাবে?

যদি মনে হয় এটা তারই পাথর, তা হলে যাবে বই কী।

তার মানে আপনার কি ধারণা এটা তার নাও হতে পারে?

সেটারও আগে একটা প্রশ্ন আছে। সেটা হল, বাংলাদেশের বাইরে এই ভাবে টুকরো করে এই ধরনের সুপুরি খাওয়ার রেওয়াজটা আদৌ আছে কি না!

কিন্তু তা হলে–

আর কোনও প্রশ্ন নয়, তোপসে। এখন কেসটা মোড় ঘুরে নতুন রাস্তা নিয়েছে। এখন কেবল চারিদিকে দৃষ্টি রেখে অতি সন্তর্পণে গভীর চিন্তা করে এগোতে হবে। এখন কথা বলার সময় নয়।

ফেলুদা বুক পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে একটা zip-ওয়ালা অংশ খুলে তার মধ্যে পাথরটা ভরে ওয়ালেটটা আবার পকেটে পুরে উপরের বাঙ্কে উঠে গেল। আমি জানি এখন আর তাকে বিরক্ত করা চলবে না। লালমোহনবাবু কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আমি

তাঁকে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে থামিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক তখন আমাকেই বললেন, জানো ভাই–রহস্য গল্প লেখা ছেড়ে দেব ভাবছি।

আমি বললাম, কেন? কী হল?

গত দুদিনের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটল, সে সব কি আর বানিয়ে লেখা যায়, না ভেবে বার করা যায়? কথায় বলে না–টুথ ইজ স্ট্রঙ্গার দ্যান ফিকশন।

স্ট্রঙ্গার না, কথাটা বোধহয় স্ট্রেঞ্জার।

স্ট্রেঞ্জার?

হ্যাঁ। মানে আরও বিস্ময়কর।

কিন্তু স্ট্রেঞ্জার মানে তো আগন্তুক। ও, না না।–স্ট্রেঞ্জ, স্ট্রেঞ্জার, স্ট্রেঞ্জেস্ট...

আমি একটা কথা ভদ্রলোককে না বলে পারলাম না। জানতাম এটা বললে উনি খুশি হবেন।

আপনার জন্যেই কিন্তু হিরোটা পাওয়া গেল। আপনি সুপুরি খেয়ে কৌটো খালি করে দিয়েছিলেন বলেই তো তলা থেকে ওই নকল সুপুরিটা বেরোল।

লালমোহনবাবু কান অবধি হেসে ফেললেন।

তা হলে আমারও কিছু কনস্ট্রিবিউশন আছে বলছি, অ্যাঁ? হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ–

তারপর আরেকটু ভেবে বললেন, আমার কী বিশ্বাস জানো তো? আমার বিশ্বাস তোমার দাদা এই হিরের ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, আর তাই কেসটা নিলেন। নইলে ভেবে দেখ-দুবার দুবার বাক্স চুরি হল, কিন্তু দুবারই আসল জিনিসটা আমাদের কাছেই রয়ে গেল। আগে থেকে জানা না থাকলে কি এটা হয়?

সত্যিই তো! লালমোহনবাবু ভালই বলেছেন। ওই সুপুরির কৌটো এখনও চোরেরা নিতে পারেনি। দিল্লিতে হাটেলের ঘরে ঢুকে বাক্স চুরির গোঁয়াতুমিও মাঠে মারা গেছে। হিরোটা এখনও আমাদের হাতে, মানে ফেলুদার পকেটে।

তার মানে শয়তানদের হাত থেকে এখনও রেহাই নেই।

হয়তো সিমলায় গিয়েও নেই...

এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুমচা যখন ৩৬ল। ৩২১বোধহয় মাঝরাত্তির। ট্রেন ছুটে চলেছে কালকার দিকে। বাইরে এখনও অন্ধকার। আমাদের কামরার ভিতরেও অন্ধকার। তার মানে ফেলুদাও ঘুমোচ্ছে। উলটাদিকে লোয়ার বার্থে জটায়ু। রিডিং ল্যাম্পট জ্বালিয়ে হাতের ঘড়িটা দেখব, এমন সময় চোখ পড়ল। দরজার দিকে। দরজার ঘষা কাচের উপর আমাদের দিক থেকে পর্দা টানা রয়েছে। সেই পর্দার বাঁ পাশে একটা ফাঁক দিয়ে কাচের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। সেই কাচের উপর পড়েছে একটা মানুষের ছায়া।

মানুষটা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কী যেন করছে।

একটুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বুঝলাম, সে হাতলটাি ধরে ঠেলে দরজাটাকে খোলার চেষ্টা করছে। জানি দরজা লক করা আছে, খুলতে পারে না, কিন্তু তাও আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

কতক্ষণ এইভাবে চলত জানি না, হঠাৎ পাশের সিট থেকে লালমোহনবাবু ঘুমের মধ্যে বুমেরাং বলে চেঁচিয়ে ওঠাতে লোকটার ছায়াটা কাচের উপর থেকে সরে গেল।

বেশ বুঝতে পারছিলাম যে এত শীতের মধ্যেও আমি দস্তুর মতো ঘেমে গেছি।

৮. দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি

আমি দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি, এবারে প্লেনে দিল্লি আসার সময় দিন পরিষ্কার ছিল বলে দূরে বরফে ঢাকা অন্নপূর্ণ দেখেছি, সিনেমাতে শীতের দেশের ছবিতে অনেক বরফ দেখেছি, কিন্তু সিমলাতে এসে চোখের সামনে বরফ দেখতে পেয়ে যেরকম অবাক হয়েছি। সেরকম আর কখনও হইনি। রাস্তায় যদি আমাদের দেশের লোক না দেখতাম, তা হলে ভারতবর্ষে আছি বলে মনেই হত না। অবিশ্যি শহরটার চেহারাতে এমনিতেই একটা বিদেশি ভাব রয়েছে। তার কারণ, ফেলুদা বলল, দার্জিলিং-এর মতো সিমলাও নাকি সাহেবদেরই তৈরি। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে লেফটেন্যান্ট রস বলে একজন সাহেব নাকি সিমলায় এসে নিজের থাকার জন্য একটা কাঠের বাড়ি তৈরি করে। সেই থেকে শুরু হয় সিমলায় সাহেবদের বসবাস। ভাগ্যিস সাহেবরা গরমে কষ্ট পেত, আর তাই গরমকালে ঠাণ্ডা ভোগ করার জন্য পাহাড়ের উপর নিজেদের থাকার জন্য শহর তৈরি করে নিত।

কালকা থেকে মিটার গেজের ছোট ট্রেনে এখানে আসার পরে বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটেনি। সেই কানে তুলো গোঁজা বুড়ো লোকটা কিন্তু একই গাড়িতে সিমলা এসেছে, আর আমাদের সঙ্গে একই ক্লার্কস হোটেলে উঠেছে। তবে লোকটা এখন আমাদের দিকে আর বিশেষ নজর দিচ্ছে না, আর আমারও মনে হচ্ছে ওকে সন্দেহ করে আমরা হয়তো ভুলই করেছিলাম। সত্যি বলতে কী, এখন লোকটাকে প্রায় নিরীহ গোবেচারা বলেই মনে হচ্ছে। লালমোহনবাবুও আমাদের সঙ্গে ক্লার্কসেই উঠেছেন। এই বরফের সময় খুব বেশি লোক বোধ হয় সিমলায় আসে না, তাই উনি আগে থেকেই রিজার্ভ না করেও একটা ঘর পেয়ে গেছেন।

ফেলুদা হাটেলে এসে ঘরে জিনিসপত্র তুলেই পোস্টাপিসের খোঁজে বেরিয়ে গেল। আমরাও যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও বলল বাক্সটাকে চোখে চোখে রাখা দরকার। তাই আমরা দুজনেই থেকে গেলাম। ফেলুদা কিন্তু এসে অবধি সিমলা বা তার বরফ সম্বন্ধে

কোনও মন্তব্যই করেনি। আর ঠিক তার উলটাটা করছেন লালমোহনবাবু। যা কিছু দেখেন তাতেই বলেন, ফ্যানাস্ট্যাটিক। আমি যখন বললাম, যে কথাটা আসলে ফ্যান্টাস্টিক, তাতে ভদ্রলোক বললেন। যে উনি নাকি ইংরিজি এত অসম্ভব তাড়াতাড়ি পড়েন যে প্রত্যেকটা কথা আলাদা করে লক্ষ করার সময় হয় না। এ ছাড়া সিমলায় পোলার বেয়ার আছে কি না, এখানেও আকাশে অরোরা বোরিয়ালিস দেখা যায় কি না, এই বরফ দিয়ে এস্কিমোদের বাড়ি ইলগু (আমি বললাম কথাটা আসলে ইগলু) তৈরি করা যায় কি না–এই সব উদ্ভট প্রশ্ন করে চলেছেন অনবরত।

ক্লার্কস হাটেলটা পাহাড়ের ঢালু গায়ের উপর তৈরি। হাটেলের দোতলার সামনের দিকে একটা লম্বা বারান্দা, আর বারান্দা থেকে বেরোলেই রাস্তা। দোতলাতেই ম্যানেজারের ঘর, লাউঞ্জ বা বসবার ঘর, আমাদের ডাবল রুম আর লালমোহনবাবুর সিঙ্গল রুম। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় আরও থাকার ঘর রয়েছে, আর রয়েছে ডাইনিং রুম।

ফেলুদার ফিরতে দেরি হয়েছিল বলে আমাদের লাঞ্চ খেতে খেতে হয়ে গেল প্রায় দুটো। ডাইনিং রুমের এক কোণে ব্যান্ড বাজছে, লালমোহনবাবু সেটাকে বললেন কনসার্ট। আমরা তিনজন ছাড়া ঘরে রয়েছেন সেই কানে তুলো গোঁজা বৃদ্ধ–যার দিকে লালমোহনবাবু আর দেখছেন না-আর অন্য আরেকটা টেবিলে বসেছেন তিনজন বিদেশি-দুজন পুরুষ আর একজন মহিলা। আমরা যখন খেতে ঢুকছি। তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল একজন কালো চশমা পরা খুঁচোলো দাড়িওয়ালা মাথায় বেরে। ক্যাপ পরা ভদ্রলোক। যতদূর মনে হয় সবসুদ্ধ এই আটজন ছাড়া হোটেলে আর কোনও লোক নেই।

সুপ খেতে খেতে ফেলুদাকে বললাম, ধমীজার কাছে তো আজকেই যাবার কথা?

চারটেয় অ্যাপিয়েন্টমেন্ট তিনটেয় বেরোলেই হবে।

বাড়িটা কোথায় জানো?

ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার হল পড়ে কুফ্রি যাবার পথে। এখান থেকে আট মাইল।

তা হলে এক ঘণ্টা লাগবে কেন?

অনেকখানি রাস্তা বরফে ঢাকা। পাঁচ মাইলের বেশি স্পিড় তুললে গাড়ি স্কিড় করতে পারে। তারপর লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বলল, আপনার সঙ্গে যা গরম আছে। পরে নেবেন। যেখানে যাচ্ছি সেটা সিমলার চেয়ে এক হাজার ফুট বেশি হাইটে। বরফ আরও অনেক বেশি।

লালমোহনবাবু চামচ থেকে সুড়ুত করে খানিকটা সুপ টেনে নিয়ে বললেন, শেরপা যাচ্ছে সঙ্গে?

কথাটা শুনে প্রচণ্ড হাসি পেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ফেলুদা বেশ গভীরভাবেই জবাব দিল, না। রাস্তা আছে। গাড়ি যাবে।

সুপ শেষ করে যখন মাছের জন্য অপেক্ষা করছি তখন ফেলুদা হঠাৎ লালমোহনবাবুকে বলল, আপনি যে অস্ত্রের কথা বলছিলেন সেটা কী হল?

লালমোহনবাবু একটা কাঠির মতো সরু লম্বা রুটির খানিকটা চিবোতে চিবোতে বললেন, সেটা আমার বাক্সে রয়েছে। এখনও দেখানোর ঠিক মওকা পাইনি।

ব্যাপারটা কী?

একটা বুমের‍্যাং।

ওরেব্বাস! এই কারণেই কাল রাত্রে ঘুমের মধ্যে ভদ্রলোক বুমেরাং বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।

ও জিনিসটা আবার কোথায় পেলেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

এক অস্ট্রেলিয়ান সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কাগজে। আরও পাঁচ রকম জিনিসের মধ্যে ওটাও ছিল। লোভ সামলাতে পারলুম না। শুনিচি ঠিক করে ছুঁড়তে পারলে নাকি শিকারকে ঘায়েল করে আবার শিকারির হাতেই ফিরে আসে।

একটু ভুল শুনেছেন। শিকার ঘায়েল হলে অস্ত্র শিকারের পাশেই পড়ে থাকে। লক্ষ্য যদি মিস করে তা হলেই আবার ফিরে আসে।

সে যাই হোক মশাই–ছোঁড়া খুব ডিফিকাল্ট। আমি আমাদের গড়পারের বাড়ির ছাদ থেকে ছুড়েছিলুম। তা সে বুমেরাং গিয়ে দীনেন্দ্র স্ট্রিটের এক বাড়ির তেতালার বারান্দায় ঝোলানো ফুলের টব দিলে ভেঙে। ভাগ্যে চেনা বাড়ি ছিল—তাই ফেরত পেলুম।

ওটা আজি সঙ্গে নিয়ে নেবেন।

লালমোহনবাবুর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল—ডেঞ্জার এক্সপেক্ট করছেন নাকি?

পাথরটা তো পায়নি সে লোক এখনও!

ফেলুদা যদিও কথাটা বেশ হালকাভাবেই বলল, আমি বুঝতে পারলাম যে কোনও রকম একটা গোলমালের আশঙ্কা সেও যে করছে না তা নয়।

তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় একটা নীল অ্যাম্বাসাডর ট্যাক্সি এসে আমাদের হোটেলের সামনে দাঁড়াল। আমরা তিনজনই সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছিলাম, গাড়িটা আসতেই ফেলুদা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। ড্রাইভারটা এখানকারই লোক, বয়স অল্প, বেশ জোয়ান চেহারা। ফেলুদা সামনে ড্রাইভারের পাশে বসল, তার সঙ্গে ধমীজার (নকল) বাক্স, আর আমরা দুজন পিছনে। লালমোহনবাবু তার বুমের্যাংটা ওভারকোটের ভিতর নিয়ে নিয়েছেন। কাঠের তৈরি জিনিসটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেছি। অনেকটা হকি স্টিকের তলার অংশটার মতো দেখতে, যদিও তার চেয়ে অনেক পাতলা আর মসৃণ।

আকাশে সাদা সাদা মেঘ জমেছে, তাই শীতটাও খানিকটা বেড়েছে। তবে মেঘ ঘন নয়, তাই বৃষ্টির সম্ভাবনা বিশেষ নেই।

কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় আমাদের গাড়ি ওয়াইলডফ্লাওয়ার হলের উদ্দেশে রওনা দিল। ক্লার্কস হাটেলটা শহরের ভিতরেই। এসে অবধি হাটেলের বাইরে যাওয়া হয়নি। গাড়ি যখন শহর ছেড়ে নির্জন পাহাড়ি পথ ধরল। তখন প্রথম সিমলা পাহাড়ের বরফে ঢাকা ঠাণ্ডা থমথমে মেজাজটা ধরতে পারলাম। রাস্তার এক পাশ দিয়ে পাহাড় উঠে গেছে– কোনও সময় বাঁয়ে, কোনও সময় ডাইনে। একদিকে খাড়াই, একদিকে খাদ। রাস্তা বেশি চওড়া নয়, কোনও রকমে দুটো গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে। পাহাড়ের গায়ে চারিদিক ছেয়ে রয়েছে ঘন ঝাউবন। প্রথম চার মাইল রাস্তা দিব্যি কুড়ি-পঁচিশ মাইল স্পিডে যাওয়া সম্ভব হল, কারণ এই অংশটায় রাস্তার উপরে বরফ নেই বললেই চলে। বনের ফাঁক দিয়ে দূরের পাহাড়ে বরফ দেখা যায়, আর মাঝে মাঝে রাস্তার এক পাশে বা উপর দিকে চাইলে পাহাড়ের গায়ে বরফ দেখা যায়। কিন্তু এবার ক্রমে দেখছি বরফ বাড়ছে, আর সেই সঙ্গে আমাদের গাড়ির স্পিড কমে আসছে। পাঁচ মাইলের মাথায় শুরু হল রাস্তার উপর এক হাত পুরু বরফ। তার উপরে গভীর হয়ে পড়েছে গাড়ির চাকার দাগ, সেই দাগের উপর চাকা ফেলে অতি সাবধানে এগিয়ে চলেছে। আমাদের ট্যাক্সি। মাটি এত পিছল যে মাঝে মাঝে গাড়ির চাকা ঘুরে যাচ্ছে, কিন্তু গাড়ি চলছে না।

নাকের ডগা আর কানের পাশটা ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। লালমোহনবাবু একবার রললেন তাঁর কানে তালা লেগে গেছে, আরেকবার বললেন তাঁর নাক বন্ধ হয়ে আসছে। আমি অবিশ্যি নিজের শরীর নিয়ে একদম মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি খালি ভাবছি, কী অদ্ভুত জগতে এসে পড়েছি আমরা! এ এমন একটা জায়গা যেখানে মানুষ থাকার কোনও মানেই হয় না। এখানে শুধু থাকবে বরফের দেশের রকমারি পাখি আর পোকামাকড়। কিন্তু তার পরেই আবার মনে হচ্ছে–এ রাস্তা মানুষের তৈরি, রাস্তার বরফের উপর গাড়ির চাকার দাগ রয়েছে, এ রাস্তা দিয়ে একটু আগেও গাড়ি গেছে, অনেকদিন থেকেই যাচ্ছে,

অনেকদিন ধরেই যাবে। আর সত্যি বলতে কী, আমাদের অনেক আগেই এখানে মানুষ না এলে এমন আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের দেখাই হত না।

এই অদ্ভুত তুষাররাজ্য দিয়ে আরও মিনিট কুড়ি চলার পর হঠাৎ রাস্তার ধারে একটা কালো কাঠের ফলকে সাদা অক্ষরে লেখা দেখলাম ওয়াইল্ডফ্লাওয়ার হল। এমন নির্বাঞ্জাটে আমাদের জার্নিটা শেষ হয়ে যাবে সেটা ভাবতেই পারিনি।

আরও কিছুদূর যেতেই রাস্তার ধারে একটা ফটক পড়ল। যার গায়ে ধমীজার বাড়ির নামটা লেখা রয়েছে—দি নুক! গাড়ি ডান দিকে ঘুরে গেটের মধ্যে দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই প্রকাণ্ড পুরনো বিলিতি ধরনের টাওয়ার-ওয়ালা বাড়িটা দেখা গেল। বাড়ির ছাদে আর কার্নিশে পুরু হয়ে বরফ জমে আছে। সাহেবি মেজাজের মানুষ না হলে এরকম সময় এরকম জায়গায় এরকম বাড়িতে কেউ থাকতে পারে না।

আমাদের ট্যাক্সি পেটিকের নীচে গিয়ে থামল। আমরা নামতেই গরম উর্দিপরা বেয়ারা এসে ফেলুদার হাত থেকে কার্ড নিয়ে ভেতরে গেল, আর তার এক মিনিটের মধ্যেই বাড়ির মালিক নিজেই বেরিয়ে এলেন।গুড আফটারনুন মিস্টার মিটার। আপনার পাংচুয়ালিটি প্রশংসনীয়। ভেতরে আসুন, প্লিজ।

ধমীজার ইংরিজি উচ্চারণ শুনলে সাহেব বলে ভুল হয়। বর্ণনা শুনে যে রকম কল্পনা করেছিলাম, চেহারা মোটামুটি সেইরকমই। ফেলুদা আমার আর লালমোহনবাবুর সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিলে পর আমরা সবাই একসঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম। কাঠের মেঝে ও দেয়ালওয়ালা প্রকাণ্ড ড্রইংরুম, তার এক পাশে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। সোফায় বসার আগেই ফেলুদা তার হাতের ব্যাগটা তার আসল মালিকের হাতে তুলে দিল। ধমীজার নিশ্চিন্ত ভাব দেখে বুঝলাম সে আমাদের ভাওতা একেবারেই ধরতে পারেনি।

থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ। মিস্টার লাহিড়ীর ব্যাগটাও আমি হাতের কাছেই এনে রেখেছি।

একবার ঢাকনা খুলে ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিন, ফেলুদা হালকাভাবে সাহেবি হাসি হেসে বলল!

ধমীজও হেসে ওয়েল, ইফ ইউ সে সো, বলে ঢাকনাটা খুলল। তারপর জিনিসপত্র আলতোভাবে ঘেঁটে বলল, সব ঠিক আছে-কেবল এই খবরের কাগজগুলো আমার নয়।

আপনার নয়? ফেলুদা প্রশ্ন করল। সে ইতিমধ্যে কাগজগুলো ধমীজার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছে।

না। অ্যান্ড নাইদার ইজ দিস। ধমীজা কালকা স্টেশন থেকে কেনা সুপুরি ভরা কোডাকের কীটোটা ফেলুদাকে দিয়ে দিল। বাকি সব ঠিক আছে।

ওঃ হো, ফেলুদা বলল, ওগুলো বোধহয় ভুল করে আপনার বাক্সে চলে গেছে। যাক-তা হলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ধমীজার সঙ্গে ওই পাথরের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা হলে ওই কৌটো কী করে গেল ওই বাক্সের মধ্যে?

অ্যান্ড হিয়ার ইজ মিস্টার লাহিড়ীজ ব্যাগ।

ঘরের এক পাশে একটা টেবিলের উপর থেকে দীননাথবাবুর ব্যাগটা ফেলুদার হাতে চলে এল। ধমীজা হেসে বললেন, আপনি যে কথাটা আমাকে বললেন, আমিও আপনাকে সেটা বলতে চাই—একবার ঢাকনা খুলে ভেতরটা দেখে নিন।

ফেলুদা বলল, মিস্টার লাহিড়ী কেবল একটা জিনিসের জন্যেই একটু ভাবছিলেন-একটা এনটারো-ভায়োফর্মের শিশি–

ইটস দেয়ার। রয়েছে বাক্সের ভেতর, বললেন মিস্টার ধমীজা।

–আর একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট ছিল কি?

ম্যানুস্ক্রিপ্ট?

ফেলুদা বাক্সটা খুলেছে। ঘটবার দরকার নেই, পাঁচ হাত দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ওর মধ্যে কোনও খাতা জাতীয় কিচ্ছু নেই।

ফেলুদার ভুরু ভীষণভাবে কুঁচকে গেছে। সে খোলা বাক্সটার দিকে চেয়ে রয়েছে।

কী ম্যানুস্ক্রিপ্টের কথা বলছেন আপনি? ধমীজী প্রশ্ন করল।

ফেলুদা এখনও চুপ। আমি বুঝতে পারছিলাম তার মনের অবস্থাটা কী। হয় মিস্টার ধমীজাকে মুখের ওপর চোর বলতে হয়, আর না হয় সুড়সুড়িয়ে ওই খাতা ছাড়া বাক্স নিয়েই থ্যাঙ্ক ইউ বলে চলে আসতে হয়।

ধমীজাই কথা বলে চললেন–আই অ্যাম ভেরি সরি মিস্টার মিটার, কিন্তু আমি প্রথম যখন গ্র্যান্ড হাটেলে আমার ঘরে বাক্সটা খুলি, তখন ওতে যা ছিল, এখনও ঠিক তাই আছে। খাতা তো ছিলইনা, এক টুকরো কাগজও ছিল না। আমি বাক্সের মালিকের ঠিকানা পাবার আশায় তন্ন তন্ন করে বাক্সের ভিতর খুঁজেছি। সিমলায় এসে এ বাক্স আমার আলমারির ভেতর চাবি বন্ধ অবস্থায় ছিল। এক মুহূর্তের জন্যও অন্য কোনও লোকের হাতে পড়েনি- এ গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।

এ অবস্থায় আর কী করবে ফেলুদা? সে চেয়ার ছেড়ে উঠে লজ্জিত ভাব করে বলল, আমারই ভুল মিস্টার ধমীজা। কিছু মনে করবেন না।...আচ্ছা, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।

একটু কফি, বা চা...

আজ্ঞে না। থ্যাঙ্ক ইউ! আজি আসি আমরা! গুড বাই–

আমরা উঠে পড়লাম। লেখাটা কোথায় যেতে পারে, কেন সেটা বাক্সের মধ্যে থাকবে না, সেটা কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ মনে পড়ল, নরেশ পাকড়শী বলেছিলেন, দীননাথবাবুকে ট্রেনে কোনও পাণ্ডুলিপি পড়তে দেখেননি। সেটাই কি তা হলে সত্যি কথা?

দীননাথবাবু কি তা হলে লেখার ব্যাপারটা একেবারে বানিয়ে বলেছেন?

৯. ফেরার পথে

ফেরার পথে অল্পক্ষণের মধ্যেই আরও অন্ধকার হয়ে এল। অথচ বেলা যে খুব বেশি হয়েছে তা নয়। ঘড়িতে বলছে চারটে পাঁচিশ। তা হলে আলো এত কম কেন?

গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বার করে আকাশের দিকে চাইতেই কারণটা বুঝতে পারলাম। সাদার বদলে এখন ছাই রঙের মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। বৃষ্টি হবে কি? আশা করি না। এমনিতেই রাস্তা পিছল। যদিও আমরা নীচের দিকে নামছি, তার মানে এই নয় যে, আমাদের গাড়ি আরও জোরে চলবে। বরং উতরাইয়ের স্কিড করার ভয়টা আরও বেশি। ভরসা এই যে, এ সময়টা রাস্তায় গাড়ি চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে।

ফেলুদা ড্রাইভারের পাশে চুপ করে বসে আছে, তার দৃষ্টি সামনের রাস্তার দিকে। যদিও তার মুখটা দেখতে পাচ্ছি না, তবুও কেন জানি মনে হচ্ছে তার ভুরুটা কুঁচকোনো। বেশ বুঝতে পারছিলাম ওর মাথার মধ্যে কী চিন্তা ঘুরছে। হয় দীননাথবাবু না হয়। ধমীজা মিথ্যে কথা বলছেন। ধমীজার বৈঠকখানাতেও আলমারি বোঝাই বই দেখেছি। তার পক্ষে শম্ভুচরণের নামটা জানা কি সম্ভব নয়? পঞ্চাশ বছর আগে ইংরিজিতে লেখা তিব্বতের ভ্রমণকাহিনীর উপর কি তার লোভ থাকতে পারে না? কিন্তু ধমীজার কাছেই যদি লেখাটা থাকে তা হলে ফেলুদা সেটা উদ্ধার করবে। কী করে?...

বেশ বুঝতে পারছিলাম যে রহস্য এখন একটার জায়গায় দুটো হয়ে গেছে-একটা হিরোর, একটা শম্ভুচরণের লেখার। একা ফেলুদার পক্ষে এই দুটো জাঁদরেল রহস্যের জট ছাড়ানো কি সম্ভব?

শীত বাড়ছে। নিশ্বাসের সঙ্গে নাক দিয়ে ধোঁয়াও বেরোচ্ছে বেশী। লালমোহনবাবু ওভারকেটের একটা বোতাম খুলে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে মুখ দিয়ে ভক ভক করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, বুমেরাংটাও ঠাণ্ডা বরফ। অষ্ট্রেলিয়ান জিনিস, শীতের দেশে কাজ

করবে তো? আমার বলার ইচ্ছে ছিল অস্ট্রেলিয়াতেও অনেক জায়গায় খুবই শীত পড়ে, এমনকী বরফও পড়ে, কিন্তু সেটা আর বলা হল না। সামনে, প্রায় একশো গজ দূরে, একটা গাড়ি উলটা দিক থেকে এসে টেরচাভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো চেষ্টা করলে কোনওরকমে কসরত করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সেটা বোধহয় বেশ বিপজ্জনক হবে।

আমাদের ড্রাইভার বার বার হর্ন দিয়েও যখন কোনও ফল হল না। তখন বুঝলাম ব্যাপারটার মধ্যে কোনও গণ্ডগোল আছে।

ফেলুদা কথা না বলে স্টিয়ারিং-এর উপর হাত রেখে গাড়ি থামাতে বলল, আর ড্রাইভারও খুব সাবধানে গাড়িটাকে রাস্তার এক পাশে পাহাড়ের এক পাশে পাহাড়ের দিকটায় নিয়ে গিয়ে থামাল। আমরা চারজনই কাদা আর বরফে প্যাঁচপেচে, রাস্তায় নামলাম।

চারিদিকে একটা নিঝুম ভাব। এত গাছ থাকা সত্ত্বেও একটা পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে না। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, সামনে একটা গাড়ি রয়েছে—আমাদেরই মতো একটা অ্যাম্বাসাডর– কিন্তু তার যাত্রী বা ড্রাইভার কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, কারুরই কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

আমরা খুব হিসেব করে রাস্তার দিকে চোখ রেখে বরফের উপর যেখানে চাকার দাগ, সেই দাগের উপর পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছি, এমন সময় লালমোহনবাবু হঠাৎ চমকে গিয়ে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে পা হড়কে একেবারে বরফের উপর মুখ থুবড়ে পড়লেন। একটা আচমকা ছপাৎ শব্দই এই ভড়কগনির কারণ। আমি জানি শব্দটা হয়েছে পাইন গাছের ডাল থেকে বরফের চাপড়া পিছলে মাটিতে পড়ার ফলে। এই অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ শব্দটা শুনে সত্যিই চমকে উঠতে হয়।

লালমোহনবাবুকে কোনওরকমে হাত ধরে টেনে তুলে আমরা আবার এগোতে লাগলাম। আরও খানিকটা এগোতেই বুঝলাম গাড়িটার মধ্যে একজন লোক বসে আছে। সামনে ড্রাইভারের সিটে।

আমাদের ড্রাইভার বলল লোকটাকে চেনে। ট্যাক্সিটাও ওর জানা। লোকটা ওই ট্যাক্সিটার ড্রাইভার। নাম অরবিন্দ। উও মরা গিয়া হোগা...ইয়া বেহুশ হা গিয়া–আমাদের ড্রাইভার হারবিলাস মন্তব্য করল।

ফেলুদার হাত ওর কোটের ভিতরে চলে গেছে। আমি জানি এখানে আছে। ওর রিভলবার। ছপাৎ! আবার এক চাপড়া বরফ মাটিতে পড়ল কাছেই কোনও একটা গাছ থেকে। লালমোহনবাবু চমকে উঠলেও এবার আর আছড়ে খেলেন না। কিন্তু তার পরমুহূর্তেই যে ব্যাপারটা ঘটল তাতে আরেকবার তাকে বরফে গড়াগড়ি দিতে হল।

একটা কান-ফটানো পিস্তলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনে ঠিক দুহাত দূরে রাস্তার খানিকটা বরফ তুবড়ির মতো ফিনকি দিয়ে উঠল, আর শব্দটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চারিদিকের পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

আমরা গাড়িটার বেশ কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। শব্দটা শোনা মাত্র ফেলুদা এক হ্যাঁচকায় আমাকে টেনে নিয়ে গাড়িটার পাশে বরফের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আর তার পরমুহুর্তেই লালমোহনবাবু গড়াতে গড়াতে আমাদের ঠিক পাশেই হাজির হলেন। আমাদের ড্রাইভারও এক লাফে গাড়িটার পিছনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। যদিও সে বেশ জোয়ান লোক, তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে এর আগে কখনও এরকম অবস্থায় পড়েনি।

গুলিটা এসেছে আমাদের রাস্তার ধারের খাড়াই পাহাড়টার উপরের দিক থেকে। আন্দাজে মনে হয় এখন আর আততায়ী আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, কারণ এই কালো অ্যাম্বাসাডরটা আমাদের গার্ড করে রেখেছে।

আমি এই মাটিতে মুখ থুবড়োনো অবস্থাতেও বুঝতে পারলাম কী যেন একটা নতুন ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে। আমার ঘাড়ে কী যেন একটা ঠাণ্ডা সুড়সুড়ি দিচ্ছে। ঘাড়টা ঘুরিয়ে পাশে তাকাতেই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কী! চারিদিক ঘিরে আকাশ থেকে মিহি তুলোর মতো বরফ পড়তে শুরু করেছে। কী অদ্ভুত সুন্দর এই বরফের বৃষ্টি। এই প্রথম জানলাম যে বরফ পড়ার কোনও শব্দ নেই। লালমোহনবাবু কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ফেলুদা জিব দিয়ে একটা সাপের মতো শব্দ করে তাকে থামিয়ে দিল।

হঠাৎ চারিদিকের নিস্তব্ধতা আবার ভেঙে গেল। এবার বন্দুকের শব্দ নয়, গাছ থেকে বরফ পড়ার শব্দ নয়, বরফের উপর গাড়ির চাকার শব্দ নয়। এবার মানুষের গলা।

শুনুন মিস্টার মিত্তির!

এ কার গলা? এ গলা যে চেনা চেনা মনে হচ্ছে!

শুনুন মিস্টার মিত্তির–আমি আপনাদের বাগে পেয়েছি সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। কাজেই কোনও কারসাজি দেখবেন না। ওতে কোনও ফল তা হবেই না, বরং আপনাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতে পারে।

চেঁচিয়ে বলা এই কথাগুলো উলটা দিকের পাহাড়ের গা থেকে বার বার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এসে ঠাণ্ডা নিস্তব্ধ পরিবেশটাকে গমগমিয়ে দিল। তারপর আবার কথা শুরু হল–

আমি আপনার কাছে শুধু একটি জিনিস চাই।

কী জিনিস?–ফেলুদা উপরে পাহাড়ের দিকে মুখ তুলে প্রশ্নটি করল!

আপনি গাড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে সামনে আসুন। আমি আপনাকে দেখতে চাই, যদিও আপনি আমাকে দেখতে পাবেন না। আপনি বেরিয়ে এলে তারপর আপনার প্রশ্নের জবাব পাবেন।

আমার কানের কাছেই একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিল কিছুক্ষণ থেকে, আমি ভাবছিলাম সেটা গাড়ির ভেতর থেকে আসছে; এখন বুঝলাম সেটা হচ্ছে লালমোহনবাবুর দাঁতে দাঁত লাগার ফলে।

ফেলুদা বরফ থেকে উঠে গাড়ির উলটা দিকে গিয়ে দাঁড়াল। তার মুখে একটা কথা নেই। বোধহয় সে বুঝতে পেরেছে। এ অবস্থায় আদেশ মানা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। ফেলুদাকে এমন বেগতিকে কখনও পড়তে হয়েছে বলে মনে পড়ল না।

আপনার সঙ্গে যে তিনজন রয়েছে, আবার কথা এল, তারা যদি কোনও রকম চালাকি করে, তা হলে তৎক্ষণাৎ তাদের ফল ভোগ করতে হবে–এটা যেন তারা মনে রাখেন।

আপনি কী চাইছেন সেটা এবার বলবেন কী? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। গাড়ির পিছনের

চাকার পাশ দিয়ে ফেলুদাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সে উপরের দিকে চেয়ে আছে। তার সামনেই পাহাড়ের গায়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে শুধু বরফের ঢাল, তার উপরে রয়েছে ঝাউবন। সেই কাউবনের আড়াল থেকে আততায়ী কথা বলছে আর আমাদের দেখছে।

আবার কথা এল–

আপনার রিভলভারটা বার করুন।

ফেলুদা বার করল।

ওটা ছুঁড়ে আপনার সামনে পাহাড়ের গায়ে বরফের ওপর ফেলে দিন।

ফেলুদা ফেলল।

আপনার কাছে কোডাকের কোটোটা আছে?

আছে।

দেখান!

ফেলুদা কোটের পকেট থেকে হলদে কৌটোটা বার করে তুলে ধরল।

এবারে ওর ভেতরে যে পাথরটা ছিল সেটা দেখান।

ফেলুদার হাত এবার কোটের বুক পকেটে চলে গেল। পাথরটা পকেট থেকে বেরিয়ে এল। ফেলুদা সেটাকে দু আঙুলের ডগায় তুলে ধরল।

কয়েক সেকেন্ড কোনও কথা নেই। লোকটা নিশ্চয়ই পাথরটা দেখছে! বাইনোকুলার আছে কি ওর সঙ্গে?

বেশ। এবার ওই কৌটোর মধ্যে ওটাকে পুরে আপনার ডান দিকে রাস্তার পাশের কালো পাথরটার উপায় রেখে আপনারা সিমলা ফিরে যান। যদি মনে করেন-

ভদ্রলোকের কথা শেষ হবার আগেই ফেলুদা বলে উঠল—আপনার পাথরটা চাই তো?

সেটাও কি বলে দিতে হবে? বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় উত্তর এল।

তা হলে এই নিন!

ব্যাপারটা এত হঠাৎ ঘটল যে আমি কয়েক সেকেন্ডের জন্য যেন চোখে অন্ধকার দেখলাম। ফেলুদা কথাটা বলেই তার হাতের পাথরটা সটান ছুড়ে দিল যেখান থেকে কথা আসছে। সেইদিকে। আর তার পরেই হল এক রক্তজল-করা বীভৎস ব্যাপার। আমাদের অদৃশ্য দুশমন সেই হিরেটাকে লুফবার জন্য ঝাউগাছের আড়াল থেকে লাফিয়ে সামনে আলোয় এসে বরফের একটা বিরাট চাই পা দিয়ে ধ্বসিয়ে টাল হারিয়ে সেই বরফের সঙ্গে পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাত উপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে রাস্তার পাশে বরফজমা নালাটার উপর এসে স্থির হলেন। গড়িয়ে আসার সময়ই অবিশ্যি তার হাত

থেকে বাইনোকুলার আর রিভলভার, চোখ থেকে কালো চশমা আর থুতনি থেকে ছুঁচোলো নকল দাড়ি ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে বরফের এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে!

এই ঘটনার পর আর লুকিয়ে থাকার কোনও মনে হয় না, তাই আমরা তিনজনেই দৌড়ে এগিয়ে গেলাম ফেলুদার কাছে। আমার ধারণা ছিল যে এতটা দূর থেকে গড়িয়ে পড়ায় লোকটা মরে না গেলেও, অজ্ঞান তো হবেই। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, সে বরফের উপর চিত অবস্থাতেই ফেলুদার দিকে জ্বলজ্বল কটা চোখে চেয়ে আছে, আর জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে।

গলাটা যে চেনা চেনা মনে হয়েছিল তাতে আর আশ্চর্য কী? ইনি হলেন ব্যর্থ ফিল্ম অভিনেতা শ্রীঅমরকুমার, ওরফে শ্রীপ্রবীর কুমার লাহিড়ী, দীননাথ লাহিড়ীর ভাইপো।

ফেলুদা ঠাণ্ডা শুকনো গলায় বলল, বুঝতেই তো পারছেন প্রবীরবাবু, এখন কে কাকে বাগে পেয়েছে। কাজেই আর কিছু লুকিয়ে লাভ নেই। বলুন, আপনার কী বলার আছে।

অমরকুমারের চিত হওয়া মুখের উপর বরফের গুঁড়ো এসে পড়ছে। সে এখনও একদৃষ্টি চেয়ে আছে ফেলুদার দিকে। আমার কাছে এখনও সব ধোঁয়াটে, কিন্তু আশা করছি প্রবীরবাবুর কথায় রহস্য দূর হবে।

ফেলুদা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, বেশ, আপনি না বলেন তো আমাকেই বলতে দিন। প্রতিবাদ করার হলে করবেন!—হিরেটা আপনি পেয়েছিলেন নেপালি বাক্সটা থেকে। খুব সম্ভবত এই মহামূল্য রত্নটাই নেপালের মাতাল রাজা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে শম্ভুচরণকে দিয়েছিলেন। নেপালি বাক্সটা আসলে সম্ভবত শম্ভুচরণের। সেটা তিনি তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁর বন্ধু সতীনাথ লাহিড়ীকে দিয়ে যান। সতীনাথের গুরুতর অসুখের জন্য সে হিরেটার কথা কাউকে বলতে পারেনি! এই কদিন মাত্র আগে হিরেট আপনি বাক্স থেকে পান। তারপরে সেটাতে রং মাখিয়ে সুপুরি বানিয়ে কোডাকের কৌটোর তলায় আঠা দিয়ে আটকে রাখেন, আর নিরাপদ জায়গা মনে করে কৌটাটা কাকার কাছ থেকে পাওয়া

বাক্সটাতে রাখেন। কিন্তু সে বাক্স যে তার পরদিন আপনার ঘর থেকে আমার ঘরে চলে আসবে সেটা তো আর আপনি ভাবেননি। সেদিন আড়ি পেতে আমাদের কথা শোনার পর থেকেই আপনি বাক্সটা হাত করার তাল করেছেন। প্রথমে মিস্টার পুরির নাম দিয়ে ভাঁওতা টেলিফোন আর প্রিটারিয়া স্ট্রিটে গুণ্ডা লাগানো। তাতে ফল হল না দেখে আমাদের ধাওয়া করে দিল্লি আসা; কিন্তু তাতেও হল না। জনপথ হোটেলে আপনার বেপরোয় প্ল্যানটিও মাঠে মারা গেল। তাই বাধ্য হয়েই সিমলা আসতে হল। আর তারপর আজকের এই অবস্থা!..

ফেলুদা থামল। আমরা সবাই ফেলুদাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি, এমনকী আমাদের ড্রাইভার পর্যন্ত।

বলুন প্রবীরবাবু–আমি কি ভুল বলেছি?

প্রবীরবাবুর উগ্র চোখে হঠাৎ একটা ঝিলিক খেলে গেল। অদ্ভুত ধূর্ত চাহনিতে ফেলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, কীসের কথা বলছেন। আপনি? কোন হিরে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। হিরোটা তো বরফের তলায় তলিয়ে গেছে, আর তার উপরে আরও বরফ জমা হচ্ছে এখন।

কেন, এটা কি আপনি চেনেন না?

আবার চমক লাগার পালা। ফেলুদা এবার তার বুক পকেট থেকে আরেকটা পাথর বার করল। এই বরফ-পড়া মেঘলা বিকেলেও তার ঝালকানি দেখে তাক লেগে যায়।

বরফের উপরে যেটা রয়েছে সেটার দাম কত জানেন? পাঁচ টাকা। আজই সকালে মিলার জেম কোম্পানি থেকে কেনা! আর এটাই হল–

প্রবীরবাবু বাঘের মতো লাফ দিয়ে উঠে ফেলুদার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত থেকে হিরেটা ছিনিয়ে নিয়েছে।

ঠকাং!

আচমকা একটা মোক্ষম অস্ত্র প্রচণ্ড জোরে প্রবীরবাবুর মাথায় বাড়ি মেরে তাকে অজ্ঞান করে দিল। তার শরীরটা আবার এলিয়ে পড়ল বরফের উপর। তার হাতের মুঠো খুলে গেল। তার হাত থেকে হিরে আবার ফিরে এল ফেলুদার হাতে।

থ্যাঙ্ক ইউ, লালমোহনবাবু!

ফেলুদার ধন্যবাদটা লালমোহনবাবুর কানো গেল কি না জানি না। তিনি এখনও তাঁর নিজেরই হাতে ধরা বুমের‍্যাংটার দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

১০. অমরকুমার এখন কেঁচো

অমরকুমার এখন কেঁচো! সিমলা ফেরার পথে গাড়িতেই ও সব স্বীকার করেছে। ফেলুদা অবিশ্যি ওর নিজের রিভলভারটা উদ্ধার করে নিয়েছিল, আর সেটা হাতে থাকায় প্রবীরবাবুকে দিয়ে সত্যি কথা বলতে সুবিধে হয়েছিল। ভদ্রলোকের মাথায় বুমেরাঙের বাড়ি মেরে আবার লালমোহনবাবুই রাস্তা থেকে খানিকটা বরফ তুলে সেখানটায় লাগিয়ে দিয়েছিলেন। অবিশ্যি ভদ্রলোকের তাতে উপকার হয়েছিল কি না জানি না। বেতঁশ ড্রাইভারও এখন অনেকটা সুস্থ। তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে দলে টানতে না পেরে শেষটায় গায়ের জোরে ঘায়েল করেন প্রবীরবাবু।

অশরীরী ছবি থেকে বাদ যাবার পর থেকেই প্রবীরবাবুর মাথাটা বিগড়ে যায়, কারণ ওর বিশ্বাস ছিল ফিল্মে অভিনয় করে ওর অনেক পয়সা ও নাম-ডাক হবে। ব্যাগড়া দিল ওর গলার স্বর। সিধে রাস্তায় কিছু হবে না জেনে বাঁকা রাস্তার কথা ভাবেন। সেই সময় বেরোয় নেপালি বাক্স। সেই বাক্স ঘেঁটে প্রবীরবাবু পেয়ে গেলেন একটা পলকাটা পাথর। যাচাই করে দাম জেনে চোখ কপালে উঠে যায়। এবার স্বপ্ন দেখেন নিজেই ছবি প্রডিউস করে নিজেই হবেন তার হিরো, কেউ তাকে বাদ দিতে পারবে না। তার পরের যে ঘটনা, সেটা তো আমাদের জানাই।

আপাতত প্রবীরবাবুকে রাখা হয়েছে সিমলায় হিমাচল প্রদেশ স্টেট পুলিশের জিন্মায়। হিরোটা পাবার পর থেকেই ফেলুদার প্রবীরবাবুকে সন্দেহ হয়েছিল, তাই সিমলায় এসেই দীননাথবাবুকে টেলিফোন করে চলে আসতে বলে—যদিও কারণটা বলেনি। উনি কাল এগারোটার গাড়িতে এসে ভাইপো সম্বন্ধে যা ভাল বোঝেন করবেন। হিরোটা বোধহয় দীননাথবাবুরই হাতে চলে যাবে, কারণ সেটা এসেছিল তাঁর জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে।

আমি সব শুনেটুনে বললাম, হিরের ব্যাপারটা তো বুঝলাম, কিন্তু শম্ভুচরণ বোসের ভ্রমণকাহিনীটা কোথায় গেল?

ফেলুদা বলল, ওটা হল দু নম্বর রহস্য। দোনলা বন্দুক হয় জানিস তো? সেইরকম আমাদের এই বাক্স-রহস্যটা হল দোনলা রহস্য।

এই দ্বিতীয় রহস্যটার কিছু কিনারা হল? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

হয়েছে, থ্যাঙ্কস টু খবরের কাগজ অ্যান্ড জলের গেলাস।

শম্ভুনাথের খাতার রহস্যের চেয়ে ফেলুদার এই কথার রহস্যটা আমার কাছে কিছু কম বলে মনে হল না।

বাকি রাস্তাটা ফেলুদা আর কোনও কথা বলেনি।

এখন আমরা ক্লার্কস হাটেলের উত্তর দিকের খোলা ছাদে রঙিন ছাতার তলায় বসে। হট চকোলেট খাচ্ছি। সবসুদ্ধ আটটা টেবিলের মধ্যে একটাতে আমরা তিনজন বসেছি, আরেকটাতে দুজন জাপানি আর আরেকটা দুরের টেবিলে বসেছেন সেই কানে তুলোওয়ালা ভদ্রলোক (এখন অবিশ্যি তাঁর কানে আর তুলো নেই)। আকাশে মেঘ কেটে গেলেও সন্ধ্যা হয়ে এসেছে বলে আলো এমনিতেই কম। পূব দিকে পাহাড়ের গায়ে সিমলা শহর বিছিয়ে রয়েছে, শহরের রাস্তায় আর বাড়িগুলোতে একে একে আলো জ্বলে উঠছে।

লালমোহনবাবু এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। দেখে বুঝতে পারছিলাম কী যেন ভাবছেন। অবশেষে চকোলেটে একটা বড় রকম চুমুক দিয়ে বললেন, সব মানুষের মনের মধ্যেই বাধহয় একটা হিংস্রতা বাস করে। তাই নয় কি ফেলুবাবু? বুমের্যাঙের বাড়িটা মারতে ভদ্রলোক যখন পাক খেয়ে পড়ে গেলেন, তখন ভেতরে একটা উত্তেজনা ফিল করছিলুম যেটাকে উল্লাস বললেও ভুল হবে না। আশ্চর্য!

ফেলুদা বলল, মানুষ যে বাঁদর থেকে এসেছে সেটা জানেন তো? আজকাল একটা থিয়োরি হয়েছে যে শুধু বাঁদর থেকে নয়, আফ্রিকার এক ধরনের বিশেষ জাতের খুনে বাঁদর থেকে। কাজেই প্রবীরবাবুর মাথায় বুমের্যাঙের বাড়ি মেরে আপনার যে আনন্দ হয়েছে, সেটার জন্য আপনার পূর্বপুরুষরাই দায়ী।

আমরা যতই বাঁদর আর বুমেরাং নিয়ে কথা বলি না কেন, আমার মন কেবল চলে যাচ্ছে শম্ভুচরণের ভ্রমণকাহিনীর দিকে। কোথায়, কার কাছে রয়েছে সেই লেখা? নাকি কারুর কাছে নেই, আর কোনওদিনও ছিল না?

শেষ পর্যন্ত আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, ফেলুদা, ধমীজা মিথ্যে কথা বলছেন, না। দীননাথবাবু?

ফেলুদা বলল, দুজনের কেউই মিথ্যে বলছে না।

তার মানে লেখাটা আছে?

আছে৷ ফেলুদা গম্ভীর। তবে সেটা ফেরত পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কার কাছে আছে জান?

জানি! এখন সব জানি, সবই বুঝতে পারছি। তবে সে লোককে দোষী প্রমাণ করা দুরূহ ব্যাপার। তুখোড় বুদ্ধি সে লোকের। আমাকেও প্রায় বোকা বানিয়ে দিয়েছিল।

প্রায়?

কথাটা শুনে আমার ভালই লাগল। ফেলুদা পুরোপুরি বোকা বনছে এটা ভাবাই আমার পক্ষে কষ্টকর।

মিত্তির সাহাব–

একজন বেয়ারা ছাদের দরজার মুখটাতে এসে দাঁড়িয়ে ফেলুদার নাম ধরে ডেকে এদিক-ওদিক দেখছে।

এই যে এখানে–ফেলুদা হাত তুলে বেয়ারাটাকে ডাকিল। বেয়ারা এগিয়ে এসে ফেলুদার হাতে একটা বড় ব্রাউন খাম দিল।

মৈনেজার সাহাবকে পাশ ছোড় গিয়ে আপকে লিয়ে।

খামের উপর লাল পেনসিলে লেখা–মিস্টার পি সি মিটার, ক্লার্কস হোটেল।

খামটা হাতে নিয়েই ফেলুদার মুখের ভাব কেমন জানি হয়ে গিয়েছিল। সেটা খুলে ভিতরের জিনিসটা বার করতেই একটা চেনা গন্ধ পেলাম, আর ফেলুদার মুখ হয়ে গেল একেবারে হাঁ।

এ কী—এ জিনিস-এখানে এল কী করে?

যে জিনিসটা বেরোল সেটা একটা বহুকালের পুরনো খাতা। এরকম খাতা আমাদের দেশে আর কিনতে পাওয়া যায় না। খাতার প্রথম পাতায় খুদে খুদে মুক্তোর মতো অক্ষরে লেখা A Bengalee in lamaland, আর তার তলায় মাস ও সাল Shambhoo Churn Bose, June 1917.

এ যে সেই বিখ্যাত ম্যানুসপ্রিন্ট! বলে উঠলেন লালমোহনবাবু। ভদ্রলোকের ইংরিজি শুধরে দেবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। আমি দেখছি ফেলুদার দিকে। ফেলুদার দৃষ্টি এখন আর খাতার উপর নেই। সে চেয়ে আছে তার সামনের দিকে। ফেলুদা কি তা হলে সত্যিই পুরোপুরি পাগল হয়ে গেল নাকি?

এবারে বুঝতে পারলাম ফেলুদা একটা বিশেষ কিছুর দিকে দেখছে! আমারও দৃষ্টি সেই দিকে গেল। জাপানির উঠে চলে গেছে। এখন আমরা ছাড়া শুধু একটি লোক ছাদে বসে

আছে। সে হল এক কানে তুলোওয়ালা কালো চশমা পরা নেপালি টুপি পরা বুড়ো ভদ্রলোক।

ফেলুদা একদৃষ্টে ওই ভদ্রলোকটির দিকেই দেখছে।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। আমাদের টেবিল থেকে তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে প্রথমে চশমা, আর তারপর টুপিটা খুললেন। এ চেহারা এখন চেনা যাচ্ছে, কিন্তু তাও কোথায় যেন একটা খটকা রয়ে গেছে।

ফলস টিন্থ পরবেন না? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

সার্টনলি।

পকেট থেকে এক জোড়া বাঁধানো দাঁত বার করে ভদ্রলোক উপর-নীচ দুপাটি ভরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার গালের তোবড়ানো চলে গেল, চোয়াল শক্ত হয়ে গেল, বয়স দশ বছর কমে গোল। এখন আর চিনতে কোনও কষ্ট হয় না।

ইনি হলেন ল্যানসডাউন রোডের চ্যাম্পিয়ন খিটখিটে শ্রীনরেশচন্দ্র পাকড়াশী।

কবে করিয়েছেন দাঁত? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

অর্ডার দিয়েছিলাম বেশ কিছুদিন হল, হাতে এসেছে দিল্লি থেকে ফেরার পরের দিন।

এখন বুঝতে পারলাম দীননাথবাবু কেন নরেশবাবুকে বুড়ো ভেবেছিলেন। ট্রেনে ওর ফলস টিথ ছিল না। তারপর আমরা যখন তাঁকে ল্যানসডাউন রোডে দেখেছি ততদিনে উনি দাঁত পরা শুরু করে দিয়েছেন।

ফেলুদা বলল, বাক্সটা যে আপনা থেকে বদলি হয়নি, ওটা যে কেউ প্ল্যান করে বদল করিয়েছে, এ সন্দেহ আমার অনেক আগে থেকেই হয়েছে। কিন্তু সেটা যে আপনার কীর্তি সেটা ভেবে কার করতে সময় লেগেছে।

সেটা স্বাভাবিক, নরেশবাবু বললেন, আমি ব্যক্তিটিও যে নেহাত মূর্খ নেই, সেটা নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন।

একশোবার। কিন্তু আপনার গলদটা কোথায় হয়েছিল জানেন? ওই খবরের কাগজগুলো ধমীজার বাক্সে পোরাতে। এটা কেন করেছিলেন তা জানি। খাতাটা থাকায় দীননাথবাবুর বাক্সের যা ওজন ছিল, ধমীজার বাক্স ছিল তার চেয়ে হালকা! সে বাক্স হাতে নিলে দীননাথের খটকা লগতে পারত। তাই সেটায় কাগজ পুরে ওজনটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রেনে পড়া কাগজ কে আর কষ্ট করে ভাঁজ করে বাক্সে পোরেন বলুন!

রাইট! কিন্তু সেইখানেই তো আপনার বাহাদুরি। অন্য কেউ হলে সন্দেহ করত না।

এবার একটা প্রশ্ন আছে৷ ফেলুদা বলল, আপনি বাদে সকলেই সে রাত্রে বেশ ভাল ঘুমিয়েছিলেন, তাই না?

হুঁ–তা বলতে পারেন।

অথচ দীননাথ সচরাচর ট্রেনে মোটেই ভাল ঘুমোন না। তাকে কি ঘুমের ওষুধ খাইয়েছিলেন?

রাইট! জলের গেলাসে ঘুমের বড়ি গুঁড়ো করে ঢেলে দিয়েছিলেন?

রাইট! সেকেনোল। ওটা সর্বদাই আমার সঙ্গে থাকে। ডিনারের আগে প্রত্যেককেই খাবার জল দিয়ে গিয়েছিল, এবং ধমীজা বাদে অন্য দুজনই বাথরুমে হাত ধুতে গিয়েছিল।

তার মানে ধমীজাকে খাওয়াতে পারেননি?

উহুঁ। তার ফলে রাতটা আমার মাঠে মারা যায়। ভোর ছটায় উঠে ধমীজা দাড়ি কামায়, তারপর তার জিনিসপত্র বাক্সে রেখে বাথরুমে যায়। সেই সুযোগে আমি আমার কাজ সারি। তখনও অন্য দুজন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

তবে আপনার সবচেয়ে চালাকি কোনখানে জানেন? লেখাটা হাত করার পরেও আমার আছে এসে সেটার জন্য টাকা অফার করা।

মিস্টার পাকড়াশী হা হো করে হেসে উঠলেন। ফেলুদা বলল, সিমলা যেতে বারণ করে টেলিফোন ও কাগজে লেখা হুমকি–এও তো আপনার কীর্তি?

ন্যাচারেলি। প্রথম দিকে তো আমি মোটেই চাইনি আপনি সিমলা আসেন। তখন তো আপনি আমার পরম শত্রু। আমি তো ভাবছি–ফেলুমিত্তির যখন বাক্সের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে, তখন আমার এমন পারফেক্ট ক্রাইমটা ফাঁস হয়ে যাবে। প্লেনে পর্যন্ত আমি আপনার ওই বন্ধুটির পকেটে হুমকি কাগজ গুঁজে দিয়েছি তারপর ক্রমে, এই সিমলায় এসে, মনে হল লেখাটা আপনাকে ফেরত দেওয়াই উচিত।

কেন?

কারণ খাতা ছাড়া বাক্স ফেরত দিলে আপনার ঘাড়েও তো খানিকটা সন্দেহ পড়ত। সেটা আমি চাইনি। আপনি–লোকটাকে তো এ কদিনে কিছুটা চিনেছি!

থ্যাঙ্ক ইউ, নরেশবাবু। এবারে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

নিশ্চয়ই।

লেখাটা যে ফেরত দিলেন–আপনি ইতিমধ্যে এর একটা কপি করে রেখেছেন, তাই না?

নরেশবাবুর মুখ এক মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। বুঝলাম ফেলুদা একটা ওস্তাদের চাল চেলেছে। ও বলে চলল, আমরা যখন আপনার বাড়ি গেলাম, তখনই আপনি এটা কপি করছিলেন টাইপ করে, তাই না?

কিন্তু...আপনি...?

আপনার ঘরে একটা গন্ধ পেয়েছিলাম, সেটা শম্ভুচরণের নেপালি বাক্সে পেয়েছি, আর আজ পাচ্ছি। এই খাতাটায়।

কপিটা কিন্তু– আমাকে বলতে দিন, প্লিজ!–শম্ভুচরণ মারা গেছেন টোয়েন্টিওয়ানে। অর্থাৎ একান্ন বছর আগে। অর্থাৎ এক বছর আগে তার লেখার কপিরাইট ফুরিয়ে গেছে। অর্থাৎ সে লেখা আজ যে কেউ ছাপাতে পারে–তাই না?

আলবত পারে! নরেশবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন। আপনি কি বলতে চান এটা করে আমি কিছু অন্যায় করেছি? এ তো অসাধারণ লেখা–দীননাথ কি এ লেখা কোনওদিন ছাপাত? এটা আমিই ছাপব, এবং আমার এ অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

হস্তক্ষেপ না করলেও, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে তো?

তার মানে? কে করবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা? কে?

ফেলুদা ঠোঁটের কোণে সেই হাসি। আরেকবার হ্যান্ডসেক করার জন্য নরেশবাবুর দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল–

মিট ইওর রাইভ্যাল, মিস্টার পাকড়াশী। এই বাক্স-রহস্যের ব্যাপারে আমি দীননাথবাবুর কাছে কেবল একটি পারিশ্রমিকই চাইব।-সেটা হল এই খাতাটা।

বুমের‍্যাং, বলে উঠলেন জটায়ু। যদিও কেন বললেন সেটা এখনও ভেবে বের করতে পারিনি।